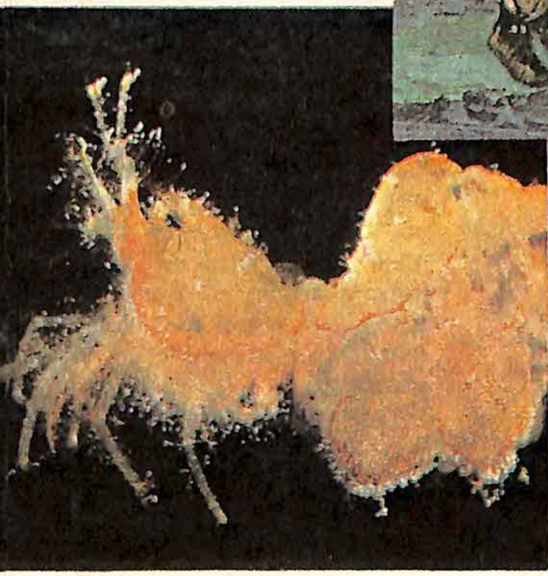
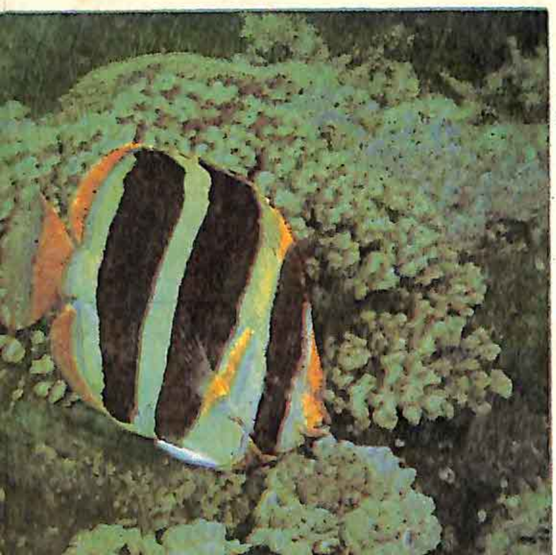
# মহাসাগরের মহাবিস্ময়



সুধাংশু পাত্র







# মহাসাগরের মহাবিস্ময়



সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আগরতলা বইমেলা
মার্চ, ১৯৮৮
ফাল্গুন, ১৩৯৪

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

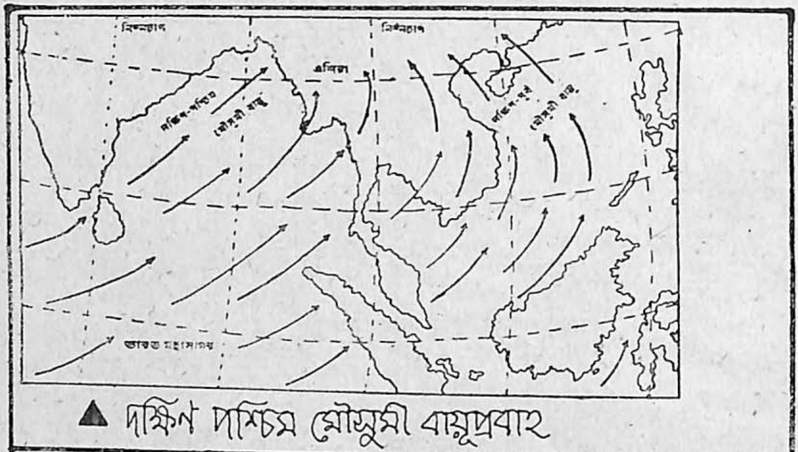
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১ বি, রাজা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

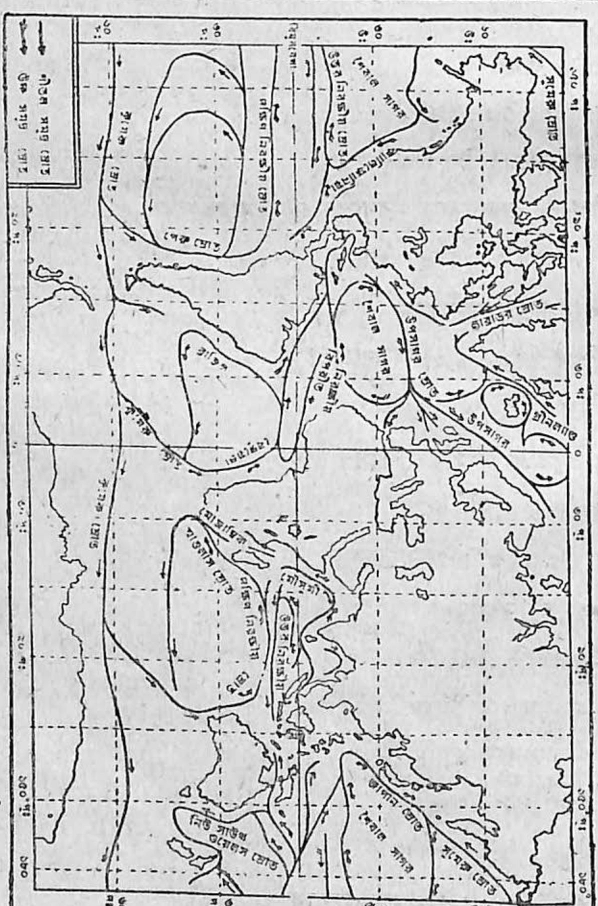
দাম : ১৫ টাকা
Rupees fifteen only

## সূচীপত্র

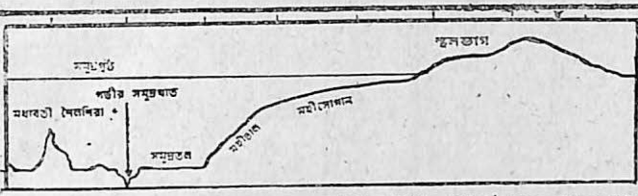

| | |
|---|---|
| প্রাক্ কথন | ৯ |
| পৃথিবীর জলভাগ | ১৪ |
| মহাসাগরের উৎপত্তি-রহস্য | ১৭ |
| সাগরের জল কেন লবণাক্ত ও সাগরের বয়স | ২০ |
| সাগর জলে দ্রবীভূত পদার্থ | ২৬ |
| মহাসমুদ্রের গভীরতা | ২৯ |
| সাগর জলের চাপ ও তাপমাত্রা | ৩৫ |
| সমুদ্র স্রোত ও বায়ুপ্রবাহ | ৪০ |
| সাগরবক্ষে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ | ৫২ |
| জোয়ার-ভাটা | ৫৮ |
| সাগর তরঙ্গ ও তার প্রভাব | ৬২ |
| সাগরের তলদেশ | ৬৬ |
| সাগরগর্ভে রত্নরাজি | ৭০ |
| সাগর জলের উদ্ভিদ | ৭৬ |
| সাগর তলার প্রাণী | ৮১ |
| গভীর জলের মাছ | ৯৫ |
| সাগরের মৎস্য সম্পদ | ৯৯ |
| সাগর—আগামীদিনের প্রত্যয় | ১০৪ |



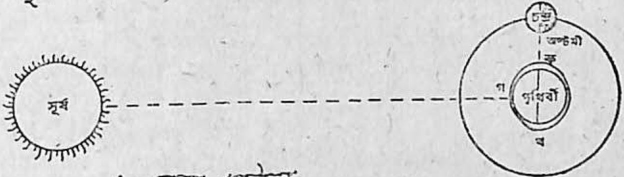
▲ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ



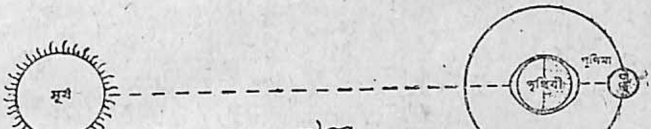
▲ সমুদ্রস্রোত




▲ স্থলভাগ থেকে নেমে গেছে সাগরের তলায়



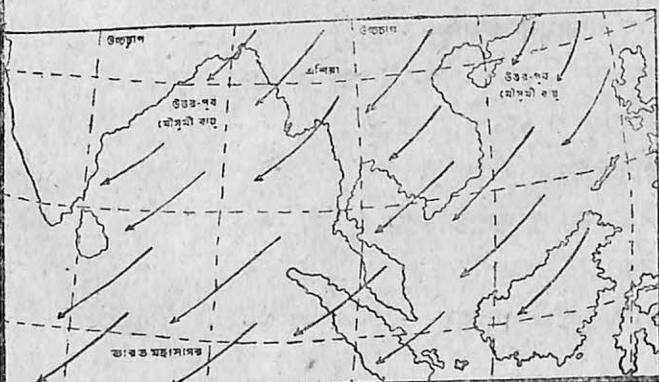

▲ মরা কটাল




▲ ভরা কটাল




মৌসুমী অঞ্চল ▶




উত্তর পূর্ব মৌসুমী অঞ্চল ◀

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানী চরিতকথা

বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা

মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান

ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র-জিজ্ঞাসা

বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ

মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা

জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ

জীবজগতের বিস্ময়

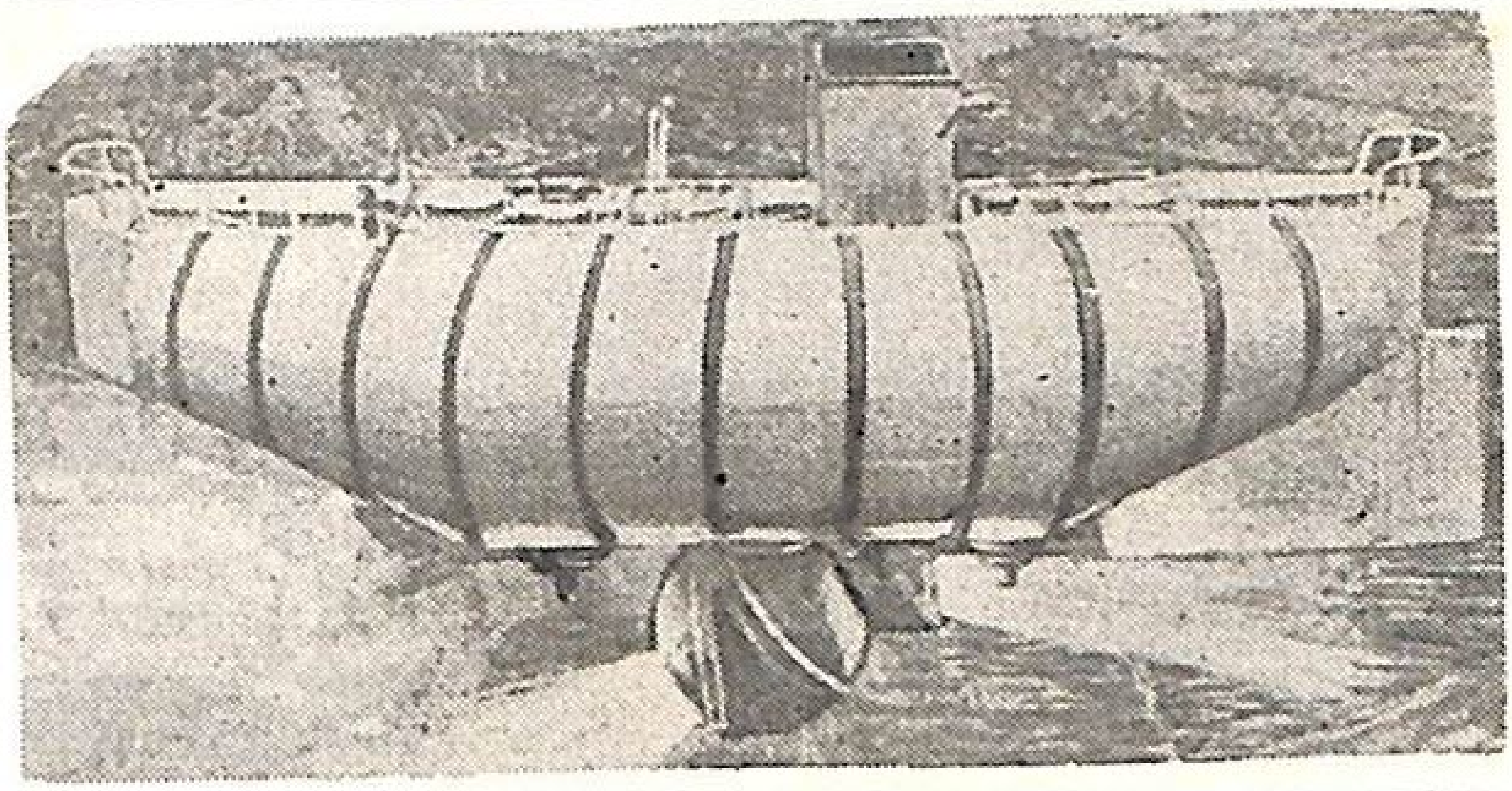
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বিজ্ঞানের সহজপাঠ

খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু

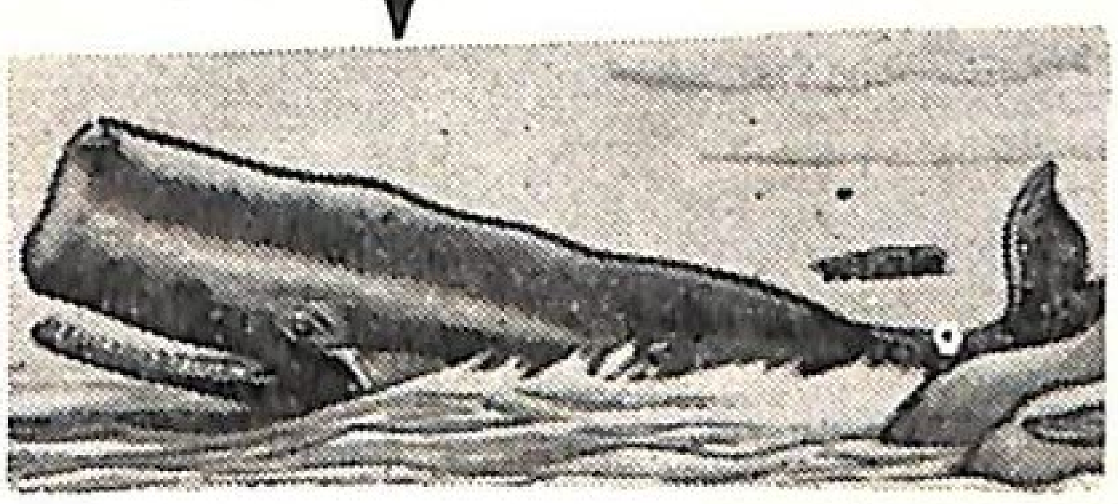
# এক নজরে তিন মহাসাগর

| বিবরণ | প্রশান্ত মহাসাগর | আটলান্টিক মহাসাগর | ভারত মহাসাগর |
|---|---|---|---|
| খাত [ গভীরতা ফ্যাদমে প্রকাশিত ] ( ১০০০ ফ্যাদম = ১$\frac{১}{৮}$ মাইল ) | পশ্চিম প্রান্তে— ১। ম্যারিয়ানা (৫৯৪০) ২। চ্যালেঞ্জার··· ৩। এমডেন (৫৯০২) ৪। টাস্কারোরা ( ৪৬৫৫ ) ৫। অ্যালুসিয়ান (৪১১৯) ৬। টোংগা-কার মাডাক (৫১৫৫) পূর্ব প্রান্তে—১। আটাকামা (৪১৭৫) | ১। ব্রেকখাত ( ৫৫৬১ ) ২। দক্ষিণ স্যান্ডউইচ ( ৪০০০ ) | ১। সুন্ডা খাত ( ৪০৭৬ ) |
| শৈলশিরা ও মালভূমি | ১। দঃ আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে মগ্ন মালভূমি—আলবাটস ২। এক উচ্চ মহীসোপান অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকাকে যুক্ত করে রেখেছে। | ১। মধ্যভাগে—মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা ২। উত্তরে—ডলফিন উচ্চভূমি ৩। দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূলে—ওয়ালভিস শৈলশিরা ৪। দঃ আমেরিকার উপকূলে রায়োগ্রান্ডি শৈলশিরা | ১। কন্যাকুমারিকা থেকে অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত বিস্তৃত—আমস্টার্ডেম সেন্টপলি মালভূমি ২। আফ্রিকার হর্ণ উপদ্বীপ অঞ্চলে—সোকোট্রা চ্যাগস ৩। মাদাগাস্কারের দক্ষিণে দঃ মাদাগাস্কার শৈলশিরা |
| প্রধান প্রধান দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ | পূর্বপ্রান্তে—১। অ্যালুসিয়ান দ্বীপ ২। চিলির দ্বীপপুঞ্জ<br>পশ্চিম প্রান্তে—১। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ২। জাপান দ্বীপপুঞ্জ ৩। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ৪। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ ৫। নিউজিল্যান্ড দ্বীপ ৬। অসংখ্য প্রবাল দ্বীপ | উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপের নিমজ্জিত মহীসোপানের সংগে যুক্ত—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ উচ্চ মালভূমি ও শৈলশিরার দ্বারা গঠিত ১। আইস ল্যান্ড ২। ফক-ল্যান্ড ৩। জর্জিয়া ৪। সীথ ল্যান্ড ৫। স্যান্ডউইচ ক্যারাবিয়ান উপসাগরে—১। কিউবা, জামাইকা হিসপানিওয়ালা প্রভৃতি দ্বীপ নিয়ে গঠিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আগ্নেয় দ্বীপ—মরক্কোর কাছে—ম্যাডিরা প্রবাল দ্বীপ—বারমুডা অভ্যন্তরস্থ দ্বীপ—এজোস, সেন্ট হেলেনা, ত্রিনিদাদ, ব্রেজিল। | মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ—<br>১। মাদাগাস্কার ২। শ্রীলংকা<br>আরাকান ইয়োমা ভংগিল পর্বতের নিমজ্জিত অংশ—আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রবালদ্বীপ—ভারতের দক্ষিণে লাক্ষা ও মালদ্বীপ। |

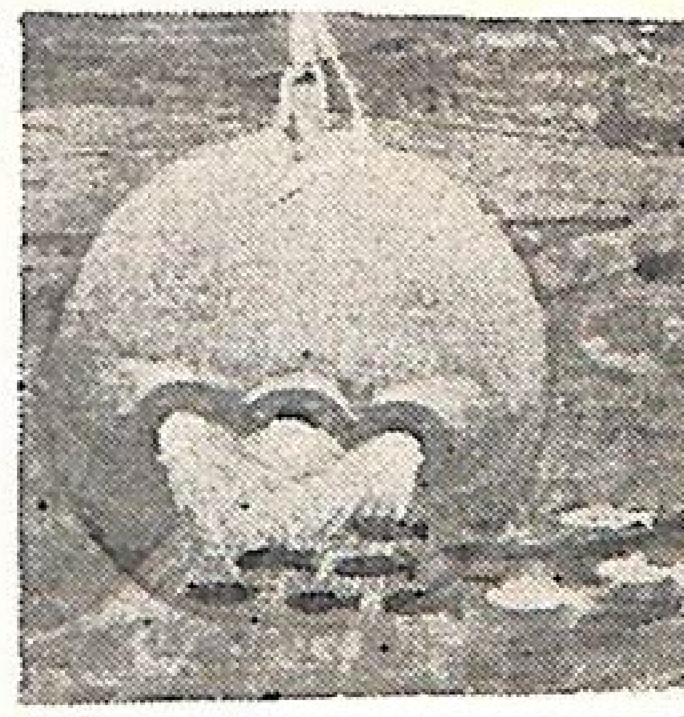


পিকার্ডের ব্যাথিস্কেফ

তিমি



ব্যাথিস্ফীয়র

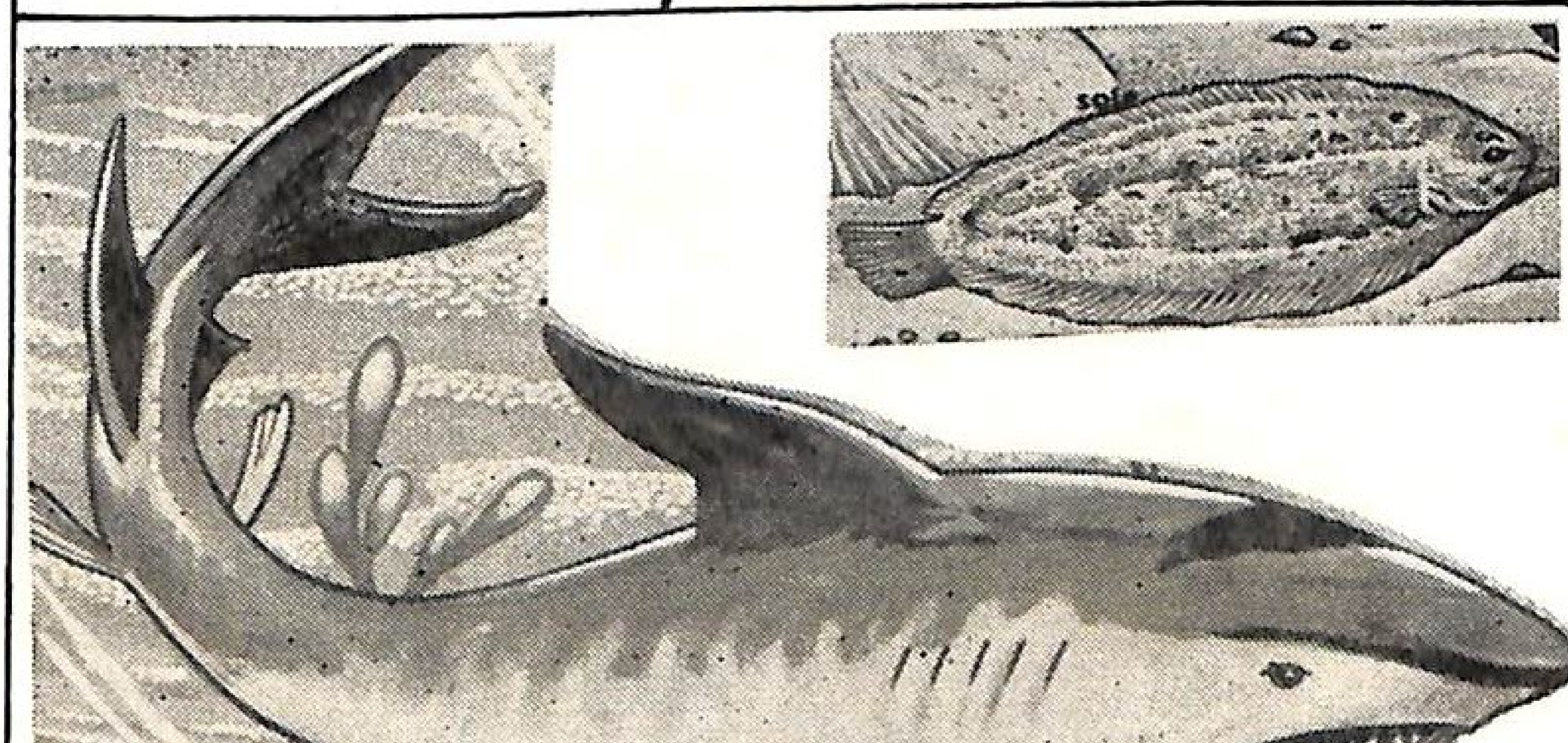


ওয়ালরাস



সীলমাছ





প্লাংটন

| বিবরণ | প্রশান্ত মহাসাগর | আটলাণ্টিক মহাসাগর | ভারত মহাসাগর |
| --- | --- | --- | --- |
| প্রধান প্রধান সাগর ও উপসাগর | পশ্চিমে—১। বেরিং সাগর ২। ওখটস্ক সাগর ৩। জাপান সাগর ৪। পীত সাগর ৫। পূর্ব চীন সাগর ৬। দক্ষিণ চীন সাগর<br>পূর্বপ্রান্তে—<br>১। কালিফোর্নিয়া উপসাগর। | ইওরোপ ভূখণ্ডে—১। উত্তর সাগর ২। বাল্টিক সাগর ৩। বিস্কে উপসাগর ৪। আদ্রিয়াতিক সাগর ৫। ভূমধ্য সাগর<br>উত্তর আমেরিকা ভূখণ্ডে—১। হাডসন উপসাগর ২। বেফিন উপসাগর ৩। মেক্সিকো উপসাগর ৪। ক্যারাবিয়ান সাগর | ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে—বঙ্গোপসাগর<br>ভারতীয় উপদ্বীপের পশ্চিমে—আরব সাগর<br>ওমান উপদ্বীপ দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ—পারস্য উপসাগর<br>আফ্রিকা ও আরবের মধ্যবর্তী—লোহিত সাগর |
| প্রধান প্রধান সমুদ্র স্রোত | ১। পেরুস্রোত ২। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ৩। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ৪। নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত ৫। নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত ৬। কুরোশিয়ো স্রোত ৭। কালিফোর্নিয়া স্রোত ৮। বেরিং স্রোত | ১। বেংগুয়েলা স্রোত ২। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ৩। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ৪। ব্রেজিল স্রোত ৫। নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত ৬। ল্যাব্রাডর স্রোত ৭। উপসাগরীয় স্রোত—(ক) উত্তর আটলাণ্টিক স্রোত (খ) ক্যানারী স্রোত | ১। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত ২। মাদাগাস্কার স্রোত ৩। মোজাম্বিক স্রোত ৪। আগুলহাস স্রোত ৫। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের শাখা- সোমালি স্রোত |
| ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র | ১। চীন সাগর ২। মেক্সিকোর পশ্চিমাঞ্চল ৩। ক্রান্তীয় অঞ্চলে | ক্যারাবিয়ান সাগর | ১। আরব সাগর<br>২। বঙ্গোপসাগর<br>৩। মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্বাংশে |
| আয়তন | ১৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার | ৭ কোটি ৮৭ বর্গ কিমি | ৭ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ কিমি |
| গড় গভীরতা | ৪০০০ ফ্যাদম | ১৭০০ ফ্যাদম | ৩৮৭০ ফ্যাদম |



কচ্ছপ
জেলি ও কড মাছ
সিন্ধু ঘোটক
অক্টোপাস
বানমাছ
প্রবাল
কাঁকড়া

# প্রাক কথন

মানুষ আজ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান। তার অভিধান থেকে অসম্ভব, অসমর্থ, অসাধ্য প্রভৃতি শব্দগুলি একেবারে মুছে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুদ্র নর এবং ক্ষুদ্র তার দৃষ্টিসীমা হলেও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণের দ্বারা সেই দৃষ্টিকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনকভাবে প্রসারিত করেছে। আপন সৌরজগৎ তো বটেই শত শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থানকারী নক্ষত্রজগৎও মস্তক অবনত করেছে। অপরদিকে তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ভূত্বক ভেদ করে নিবদ্ধ হয়েছে পৃথিবী কেন্দ্রে, অনন্ত মহাশূন্য থেকে সংগ্রহ করছে নিত্য নতুন খবর, দলে দলে হানা দিতে চাইছে গ্রহে-উপগ্রহে। তবু কি আশ্চর্য ! এই পৃথিবীর অতলান্ত মহাসাগর-গুলির তলদেশ আজও থেকে গেছে অনেকটা রহস্যাবৃত। এ যেন রূপকথার সেই দৈত্য ও রাজকন্যার গল্প। দৈত্য রাতারাতি অরণ্যকে উচ্ছেদ করে সমৃদ্ধ এক জনপদ রচনা করল, সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করল, বিশ্বের ঐশ্বর্যকে একত্রিত করল, কিন্তু পারল না রাজকন্যার একগাছি কোঁকড়ানো চুলকে সোজা করতে। তেমনই মানুষ আজ কোটি কোটি মাইল দূরে গোপনচারী গ্রহগুলির পৃষ্ঠদেশের ছবি তুলতে সমর্থ হচ্ছে তথাপি পারছে না সাগর গর্ভের বিস্তীর্ণ এলাকার ছবি গ্রহণ করতে। পৃথিবীর জনভার লাঘব করতে গ্রহে-উপগ্রহে উপনিবেশ গঠনের পরিকল্পনা করছে তথাপি সাগরের বুকে ঘর বাঁধতে এখনও সাহসী হচ্ছে না বা সাগরতলার সম্পদগুলিকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছে না।

তবু রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করার যেন একটা তীব্র নেশা মানুষের মনে। তার উপর সাগর গর্ভে অজস্র রত্নেরও গন্ধ পেয়েছে। তাই আজ সাগর তীরের প্রতিটি দেশের দল দল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ

সাগর সম্বন্ধে গবেষণায় রত। নিত্য পরিবেশন করছেন নতুন নতুন সংবাদ। অপরদিকে সাগরতলার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে নিখুঁত তথ্য আহরণ করেছেন, সম্পদ আহরণের কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং জলভাগ সমূহের ভৌগোলিক বিবরণও দাখিল করেছেন।

সাগর-মহাসাগর সম্বন্ধে গবেষণা বর্তমানে অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করলেও, এর বিশাল জলরাশি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছিল বলেও মনে হয়। কেননা কেবলমাত্র ভেলাকে অবলম্বন করে তারা যে জলপথে দূর-দূরান্তরে যাত্রা করতো—তার প্রমাণ অনেক পাওয়া গেছে। সাগরের উপকূলে তারা ঘুরে বেড়াতো, মাছ-কাঁকড়া ধরতো এবং বেলাভূমি থেকে স্বর্ণরেণুও কুড়াতো।

পরবর্তী মিশর, ব্যাবিলন, সিন্ধু, ক্রীটদ্বীপ প্রভৃতি সভ্যতার উত্থানের যুগে সাগর সম্বন্ধে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল মানুষ। আরও পরে গ্রীক ও রোমান আমলে উন্নত ধরণের জলযান নির্মিত হওয়ায় পৃথিবীর বহু সাগর, উপসাগর ও মহাসাগরকে মাথা নত করতে হয়েছিল। কথিত আছে, রোমান আমলে বাঙ্গালীরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতেও বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করতো। কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতাকে কেউ লিপিবদ্ধ করে যায়নি। তাই পুরাকালে সমুদ্র সম্বন্ধে তথা পৃথিবীর জলভাগ সম্বন্ধে কতখানি গবেষণা হয়েছিল তা আদৌ জানা যায় না।

খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ভাইকিংরা সাগরবক্ষগুলিকে এক-রকম চষে ফেলেছিল বলা যায়। এরা ছিল জলদস্যু। যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, ওরা আটলান্টিক মহাসাগর ধরে ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমে ও উত্তরপূর্বে বহুদূর পর্যন্ত ওদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবিষ্কারও করেছিল গ্রীণল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপকে। রাশিয়ার উপকূলভাগে তো বটেই, উত্তর আমেরিকায়ও তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। তবুও তারা সাগর-মহাসাগর-গুলি সম্বন্ধে নীরব থেকে গেছে।

মধ্যযুগে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ জলভাগগুলি সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার গড়ে উঠেছিল এবং তারই ফলে কোন দেশ সমুদ্রযাত্রা বিশেষ করতো না। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য এবং লুণ্ঠনের জন্য পাশ্চাত্যের দু-একটি দেশের দুর্ধর্ষ জলদস্যুরাই কেবল সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। তবে খুব বেশী পথ তারা অতিক্রম করতো না। সাধারণের মনে ধারণা গড়ে উঠেছিল, সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করে যতসব ভয়ঙ্কর দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত ইত্যাদি। শুধু কি তাই! আরও মনে করতো, সাগরের কোথাও কোথাও জল টগবগ করে ফুটছে; কোথাও ঊর্ধ্বাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে গনগনে আগুন, কোথাও প্রচণ্ড ঝড় সাগর বক্ষকে তোলপাড় করে ছাড়ছে, আবার কোথাও প্রবল ঘূর্ণাবর্ত সাগরবক্ষে ভাসমান মনুষ্যনির্মিত জলযানকে নিষ্পেশিত করার জন্য ওৎ পেতে আছে।

অনুরূপ সংস্কার অবশ্য পূর্ববর্তী অভিযানকারীদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। কিঞ্চিৎ সত্যকাহিনী মানুষের মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে নানা কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ফলে সমুদ্র সম্বন্ধে ভীতি ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠে এবং সমুদ্রযাত্রাও একরকম নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে।

সমুদ্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণার সূত্রপাত ধরতে হবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে—ইউরোপে রেনাসাঁস যুগে। গবেষণার যিনি সূত্রপাত করেছিলেন তিনি "হেনরি" নামে পর্তুগালের এক রাজকুমার। নানাজনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে তিনিই প্রথম সাগরের মানচিত্র, চার্ট প্রভৃতি তৈরি করেছিলেন এবং নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য স্থাপন করেছিলেন একটি বিদ্যালয়। কথিত আছে, উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বার্থেলমিউ ডিয়াচ প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত এগিয়ে যান। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাগরবক্ষে অভিযান ও সেই থেকে শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে।

সাগর সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষক হিসাবে হেনরির নাম ইতিহাসে

অমর হয়ে আছে। সেই দিনই তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল "দি নেভিগেটার।" তবে প্রিন্স হেনরি দি নেভিগেটার সমুদ্র সম্বন্ধে নিছক কৌতূহলবশতঃ গবেষণার সূত্রপাত করেননি। এর পেছনে ছিল অন্য একটি উদ্দেশ্য। আরবীয়দের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে গেল তখন উপায় না দেখে জলপথে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যই অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হয়েছিলেম প্রিন্স হেনরি।

এদিকে ঠিক সেইসময়ে মানুষের দীর্ঘকালের কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করলেন রেনাসাঁস যুগের মহান ও দিকপাল বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, পৃথিবী গোলাকার এবং সমুদ্রবক্ষে ভূতপ্রেতরা বিরাজ করছেনা বা জলও ফুটছেনা টগবগ করে। এগুলো মানুষের নিছক অজ্ঞতার ফল।

গ্যালিলিও নিজেও সমুদ্র সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। সমসাময়িক সময়ে তাঁর মতামত জনমানসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও পরের দিকে সেই মতামতের গুরুত্ব ধরা পড়ে এবং গ্যালিলিওর চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্যে সমুদ্রযাত্রার জন্য একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তারই প্রথম ফলশ্রুতি হিসাবে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারকে ধরা যেতে পারে।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার পাশ্চাত্যের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন দেশে একটা সাড়া পড়ে যায় এবং দুঃসাহসীরা সমুদ্রযাত্রার জন্যে তৈরি হতে আরম্ভ করেন। ফলে ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হয় অভিযানের পর অভিযান, আবিষ্কৃত হয় কত দেশ ও মহাদেশ, এমনকি দুর্গম মেরু অঞ্চলের দিকেও মানুষ ছুটতে শুরু করে।

এসব অভিযানের অভিযাত্রীরা কিন্তু নীরব দর্শক ছিলেন না। আপন অভিজ্ঞতাকে ডায়েরীর পাতায় লিপিবদ্ধ করতেন। কেউ কেউ বা নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন দেশবাসীর কাছে। তাছাড়া মুদ্রণশিল্পের উন্নতি হওয়ায় এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাদির

প্রচলন থাকায় অভিযাত্রীদের অভিযানের কাহিনী প্রকাশ পাওয়ারও সুযোগ লাভ করে। অপরদিকে নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নানাস্থানের মানচিত্র ইত্যাদি অঙ্কিত হয়।

আরও পরে উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হলে সমুদ্র পরিদর্শনের ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে উঠে। সাগরতলার খবর সংগ্রহের নিমিত্ত আবিষ্কৃত হল নানা ধরণের যন্ত্রপাতি, ডুবুরিদের পোষাক ইত্যাদি। পরিশেষে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং রাডার যন্ত্র, শব্দোত্তর তরঙ্গ ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সাগর সম্বন্ধে কৌতূহলের অনেকখানি নির্বাপিত হয়েছে বিশাল সাগর ও মহাসাগরের উপরিভাগ এবং সেখানকার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে প্রায় সমূহ তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে বলা চলে। শুধু সাগরতলায় মানুষ স্বচ্ছন্দ্যভাবে বিচরণ করতে পারছেনা এবং ঐ অন্ধকার তলদেশটা এখনও কিছুটা অন্ধকারাবৃতই থেকে গেছে।

## পৃথিবীর জলভাগ

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবনীয় উন্নতি, কৃত্রিম উপগ্রহগুলির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ইত্যাদিকে একত্র করলে দেখা যায় পৃথিবী মাত্র দুটি ভাগে বিভক্ত। জলভাগ এবং স্থলভাগ। তবে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগটা অনেক বেশী। সারা পৃথিবীর তিন-ভাগ স্থান জুড়ে কেবল জল, জল আর জল। অবশিষ্ট একভাগ মাত্র স্থল।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে স্থলভাগ ও জলভাগের পরিমাণও স্থির করেছেন। তাঁদের মতে পৃথিবীর উপরিভাগের ক্ষেত্র-ফলটা ৫১ কোটি ৫৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ঐ ৫৪ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটারকে উপেক্ষা করলে পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় ৫১ কোটি বর্গকিলোমিটার এবং ঐ ৫১ কোটি বর্গকিলোমিটারের মধ্যে জলভাগ ৩৬ কোটি বর্গকিলোমিটার এবং স্থলভাগ মাত্র ১৫ কোটি বর্গকিলোমিটার। নিখুঁত হিসাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭১˙৪ অংশ জলভাগ এবং ২৮˙৬ অংশ স্থলভাগ।

পৃথিবীপৃষ্ঠের ঐ সুবৃহৎ জলভাগটাকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি মহাসাগর নামে খ্যাত। মহাসাগরগুলির নাম (১) প্রশান্ত মহাসাগর (২) আটলান্টিক মহাসাগর (৩) ভারত মহাসাগর (৪) সুমেরু মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর এবং (৫) কুমেরু মহাসাগর বা দক্ষিণ মহাসাগর।

মহাসাগরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশান্ত মহাসাগর। পৃথিবীর মোট ৩১ কোটি বর্গকিলোমিটার জলভাগের মধ্যে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরই ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার স্থান অধিকার করে আছে। পৃথিবীর স্থলভাগ অপেক্ষাও প্রায় দেড় কোটি কিলোমিটার বেশী। সুবিশাল এই মহাসমুদ্রের কুলকিনারা যেন করা যায় না। এর শান্ত ও নিস্তরঙ্গ রূপ দেখে ম্যাগেলানই প্রথম নামকরণ করেছিলেন

পেসফিক ওসেন বা প্রশান্ত মহাসাগর। এর বিস্তৃতি এশিয়া মহাদেশে পূর্ব উপকূল থেকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত। বহু সাগর ও উপসাগর এর সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে পীত সাগর, চীন সাগর জাপান সাগর, ওর্খটস্ক সাগর, বেরিং সাগর, সেলিবিস সাগর, আলাস্কা উপসাগর ও কালিফোর্ণিয়া উপসাগর প্রধান।

বিশালত্বের দিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পরেই আটলান্টিক মহাসাগরের স্থান। এর উপরিভাগের ক্ষেত্রফল সাত কোটি সাতাশী লক্ষ বর্গকিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেকের কম কিন্তু পৃথিবীর মোট স্থলভাগের অর্ধেক অপেক্ষা কিছু বেশী। একদিকে ইওরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং অপরদিকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা তথা আফ্রিকা ও ইওরোপের সঙ্গে আমেরিকার বিরাট ব্যবধান রচনা করেছে এই মহাসাগরটি। বেফিন উপসাগর, হাডসন উপসাগর, লাব্রাডর সাগর, বিস্কে উপসাগর, ভূমধ্যসাগর, মেক্সিকো উপসাগর, ক্যারাবিয়ান উপসাগর প্রভৃতি সাগর-উপসাগরগুলি আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।

মহাসাগরগুলির মধ্যে ভারত মহাসাগরের স্থান তৃতীয়। এর বিস্তার সাত কোটি দশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা মাত্র সাতাত্তর লক্ষ বর্গকিলোমিটার কম। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল এবং দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার। আরব সাগর, পারস্য উপসাগর, এডেন উপসাগর, শ্যাম উপসাগর প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।

সুমেরু মহাসাগর ও কুমেরু মহাসাগর উভয়েই পূর্বোক্ত মহাদেশ-গুলি অপেক্ষা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলা যেতে পারে। সুমেরু মহাসাগরের জগভাগ এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের মত এবং কুমেরু মহাসাগরের বিস্তৃতি এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গ-কিলোমিটার। মেরু প্রদেশে অবস্থিত বলে এরা বছরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকে। অপরদিকে সুমেরু মহাসাগর কোন স্থলভাগকে ঘিরে না থাকায় মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মেরুদেশে জমা হয়ে আছে

স্তূপীকৃত বরফ। দক্ষিণ মেরু স্থলভাগের উপর অবস্থিত হওয়ায় কুমেরু মহাসাগর মেরুর স্থলভাগকে ঘিরে রেখেছে। রস সাগর, ওয়েডেল সাগর প্রভৃতি কুমেরু মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত। অপরদিকে উত্তর মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্বেত সাগর, কারা সাগর, সাইবেরিয় সাগর, খাটাঙ্গা উপসাগর প্রভৃতি।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জলভাগসমূহের মোট জলের পরিমাণটাও নির্ণয় করে নিয়েছেন। তাঁদের মতে পাঁচটি মহাসাগরের যে পরিমাণ জল আছে তার পরিমাণ প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি ঘন মাইল।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, পৃথিবীর জলভাগকে পাঁচটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করলেও প্রকৃত জলভাগ তথা মহাসাগর একটিই। যদি পৃথিবীর সমূহ স্থলভাগ একই জায়গায় অবস্থান করতো ( সুদূর অতীতে কিন্তু স্থলভাগ একই জায়গায় গড়ে উঠেছিল ) তাহলে জলের ব্যবধান সৃষ্টি হতো না। পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থলভাগ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার জন্য এক একটি স্থলভাগকে ঘিরে জলের যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে সেইগুলিকে বলা হয়েছে মহাসাগর।

পৃথিবীর স্থলভাগগুলি আবার নির্দিষ্ট কোন জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট নয়। কোন কোন জায়গায় জলভাগ ক্রমশঃ সরু হয়ে ঢুকে পড়েছে স্থলভাগের মধ্যেই। এইগুলোকেই সাধারণত সাগর ও উপসাগর বলা হয়। মহাসাগর মাত্র পাঁচটি হলে কি হবে সাগর ও উপসাগরের সংখ্যা কিন্তু অনেক।

পৃথিবীর ঐ যে সুবিশাল জলরাশি—যা সাধারণত মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ ইত্যাদি নামে পরিচিত তাদের একত্রে বলা হয় বারিমণ্ডল। আর পুরো স্থলভাগকে বলা হয় শিলামণ্ডল। কবির কথায় বলতে হয় যে, অহরহ শত তরঙ্গভঙ্গে শিলামণ্ডলের চরণচুম্বন করছে বারিমণ্ডল কিংবা পরম ভক্তের মত আপন বক্ষের শোণিতধারাকে নিবেদন করছে শিলামণ্ডলের পায়ের তলায়।

# মহাসাগরের উৎপত্তি-রহস্য

জন্ম মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে জলের চিহ্নমাত্রও ছিলনা। আদিম পৃথিবী ছিল অতিশয় তপ্ত-জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ। তথাপি জন্মমুহূর্তে সে যে আবহমণ্ডলটিকে বন্দী করতে পেরেছিল, তাতে ছিল পর্যাপ্ত জলীয়বাষ্প। কোটি কোটি বছর বছর ধরে তাপ হারাতে হারাতে পৃথিবী যখন যথেষ্ট শীতল হয়ে উঠল তখন সঙ্কোচনের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন স্থান বসে গেল এবং যেসব জায়গায় শক্ত শিলাস্তর গঠিত হয়েছিল সেগুলি ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে উপরের দিকে উঁচু হয়ে উঠল। তার আগে অবশ্য শীতল হতে হতে পৃথিবীর উপরিভাগটায় পুরু ও শক্ত একটা আস্তরণ বা ভূত্বকের সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীর উপরিভাগটা শক্ত হয়ে উঠলেও অভ্যন্তরভাগ তেমনই উত্তপ্ত, তরল ও অশান্তই থেকে গেল। মাত্র কয়েক মাইল গভীর পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছিল ভূত্বকটা ( বর্তমানেও ভূত্বকটা মাত্র চল্লিশ মাইলের মত পুরু। তার নিচে অধিক ঘনত্বযুক্ত ধাতু পাথর প্রভৃতি প্রচণ্ড তাপমাত্রায় তরল অবস্থাতেই বিরাজ করছে। উপর থেকে প্রযুক্ত প্রচণ্ড চাপের ফলে ভূগর্ভের সেই প্রচণ্ড তাপমাত্রার কোনদিনই পরিবর্তন হবেনা এবং সেখানকার তরলও কোনদিন কঠিনে রূপান্তরিত হবেনা )।

প্রাথমিক অবস্থায় ভূত্বকটা বেশী পুরু না হওয়ায় অভ্যন্তরস্থ অস্থির তরল ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে অগ্ন্যুৎপাতের আকারে বাহিরে বেরিয়ে এসে জমে পাথরেও রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয় পাহাড়। অপরদিকে পৃথিবীর উপরিস্থিত আবহমণ্ডলটাও ঠাণ্ডা হওয়ায় আবহমণ্ডলস্থিত জলীয়বাষ্প ঘণীভূত হয়ে সৃষ্টি করলো মেঘ। সেই মেঘ থেকে একদিন ঝরলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। বিশেষজ্ঞদের মতে সেই বৃষ্টি ঝরেছিল বছরের পর বছর ধরে। ফলে জলে জলময় হয়ে উঠেছিল পৃথিবীপৃষ্ঠ। অর্থাৎ সারা পৃথিবীটা ডুব দিয়েছিল জলের

তলায়। এককথায় সারা পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হয়েছিল মহাসমুদ্রের। তবে সে মহাসমুদ্রের গভীরতা আজকের মত ছিল না।

অপরদিকে ভূপৃষ্ঠ জলে জলময় হয়ে ওঠায় কিছু কিছু ফাটল দিয়ে জল ভূগর্ভে নামতে থাকে। ফলে অভ্যন্তরের প্রবল উষ্ণতায় সেগুলি বাষ্পে পরিণত হয়ে অভ্যন্তরকে আরও অস্থির করে তোলে এবং প্রচণ্ড-ভাবে সেই বাষ্প চাপ দিতে থাকে। তাকে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। এখানে সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আগ্নেয়গিরির পর আগ্নেয়গিরি। ভেতরের লাভাস্রোত উপরে এসে শীতল হয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হতে হতে জলের উপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রথম এইভাবে ডাঙা আত্মপ্রকাশ করে। তবে সঙ্কোচনের মাত্রা প্রবল হওয়ার সময় কিছু কিছু কঠিন শিলাস্তরও জলের উপর মাথা উঁচু করেছিল।

এর পর কেটে যায় আরও কোটি কোটি বছর। পরের দিকে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। ভূগর্ভস্থ তরল লাভা-স্রোতের আকারে উপরে বেরিয়ে আসায় পার্শ্বস্থ এলাকা বসে যায় এবং সৃষ্টি হয় গভীর খাত। পৃথিবীর উপরিভাগটা আর সমতল থাকতে পারলো না। নিচু জায়গাগুলি থাকলো জলমগ্ন হয়ে এবং উঁচু-উঁচু পাহাড়গুলো জলের উপরে কিছু থাকলো কিছুবা জলে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকলো।

অভ্যন্তরের তরল বাহিরে এসে শক্ত হয়ে প্রকৃত ডাঙার রূপ পরিগ্রহ করেছিল আজ থেকে হয়ত মাত্র দুশ কোটি বছর আগে। সে সময় ডাঙাটা আবার একই জায়গায় অবস্থান করেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। অর্থাৎ স্থলভাগটা একটা সুবৃহৎ দ্বীপের মত মহাসমুদ্রের মাঝখানেই জেগে উঠেছিল। তবে অন্যান্য স্থানে ছোট খাটো দু-দশটা দ্বীপ যে জেগে উঠেনি এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায়না। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এবং স্তূপীকৃত প্রবালকীটের মৃতদেহ থেকে অবশ্যই কিছু কিছু দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। অপরদিকে অনুরূপ উপায়ে দ্বীপসৃষ্টি পরবর্তীকালে অনেক হয়েছে। এমন কি এখনও অব্যাহত আছে বলা যেতে পারে। তবে পরিমাণে নিতান্ত কম।

পৃথিবীর অতীতের এইসব কাহিনী বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা অনুমান করেছেন মাত্র। তাঁদের আরও অনুমান, মূল স্থলভাগটি কোন এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছোট বড় অনেক-গুলি স্থলভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ায় মহাসমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। মূল স্থলভাগ অবশ্য আয়তনে বড়ই থেকে যায়। আমেরিকা মহাদেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং কিছু কিছু দ্বীপও দ্বীপপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মগোপন করেছিল মহাসমুদ্রের মাঝখানে।

স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেই দুই স্থলভাগের মধ্যে ব্যবধান রচনা করলো জল। আর মধ্যবর্তী জলভাগ সমূহই এক একটি মহাসাগর।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আদি মহাসমুদ্রের গভীরতা কম ছিল। ধীরে ধীরে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত থেকে পাহাড় পর্বতের জন্ম হতে থাকলে একদিকে যেমন এদের শীর্ষদেশ ক্রমান্বয়ে উঁচু হতে থাকে অপরদিকে তেমনই সমুদ্রের তলদেশ বসে যেতে আরম্ভ করে। আবার একটা বিরাট জলভাগের চারদিকে ঘিরেও ডাঙার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এক কথায় স্থলভাগ যতই উঁচু ও বিস্তৃত হয়েছিল ততই গভীরতা বেড়েছিল সমুদ্রের। আদিতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের ফলে উৎপন্ন শিলা তথা আগ্নেয় শিলা সূর্যতাপ, বৃষ্টির জল, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ও জলের দ্বারা বাহিত হয়ে সঞ্চিত হয়েছিল সাগর, হ্রদ ইত্যাদির তলদেশে। তার ফলে স্থলভাগ বাড়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং ভূত্বকও পুরু হতে পেরেছিল। বর্তমান ভূত্বক অনেক বেশী পুরু হওয়ায় পূর্বের মত এত অধিক সংখ্যক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হতে পারছেনা। স্থলভাগও পারছেনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে উঠতে। শুধু শিলা ও মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

## সাগরের জল কেন লবণাক্ত ও সাগরের বয়স

আদিতে পৃথিবীর বুকে যখন মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছিল তখন তার জল আদৌ লবণাক্ত ছিলনা। সে জল নদী কিংবা পুকুরের জলের মতই ছিল স্বাদু। কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে সমুদ্রের জল লোনা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে আরও লবণাক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে ভবিষ্যতে সাগরের জল আরও অনেক-অনেক লোনা হয়ে যাবে।

সাগরের জল লোনা হওয়ার মূলে বিজ্ঞানীরা যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন, তা নিম্নে প্রদান করা গেল।

মনে হয়, সাগর জল লোনা হওয়ার কারণ সম্বন্ধে প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণা করেছিলেন রবার্ট বয়েল ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে। বয়েলের পরে পরে আরও অনেকে গবেষণা করেন। তাঁদের মধ্যে এডমণ্ড হ্যালিও ল্যাভোসিয়রের গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে এ বিষয়ে এখনও গবেষণা অব্যাহত আছে বলা যেতে পারে। প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন, ভূত্বকের উপাদানগুলির মধ্যে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড, সালফেট ও কারবনেট প্রধান। ভূত্বকের শিলাও মাটিতে অন্যান্যদের চেয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড আবার বেশী থাকে এবং উক্ত লবণটি জলে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে যখন সাগর কিংবা নদীতে গিয়ে পড়ে তখন সঙ্গে করে নিয়ে যায় প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইডকে এবং সেগুলি বছরের পর বছর জমা হয় সাগরে।

যেহেতু সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে মেঘের সৃষ্টি করে এবং সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। যেন একটা চক্রের মত সাগর থেকে জল স্থলভাগে যাচ্ছে এবং পুনরায় ফিরে আসছে সাগরে। কিন্তু নুন যেতে পারছেনা অথচ বৃষ্টিজলের মাধ্যমে নুন স্থলভাগ থেকে বরাবর সাগরে

আসতেই থাকে। কোটি কোটি বছর ধরে অনুরূপ প্রক্রিয়া চলতে চলতে থাকায় সাগর জল লোনা হতে হতে আজ এই অবস্থায় এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রক্রিয়া চলবে আর সাগরজলে নুনের পরিমাণও বাড়বে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও সিদ্ধান্তটিকে প্রমাণ করা যায়। একটি সদ্য কাটা গভীর পুষ্করিণীর গর্ভে কেবলমাত্র বৃষ্টির জলকে জমতে দিলে দেখা যাবে, পুষ্করিণীর জল যেন ঈষৎ লবণাক্ত। এর কারণ, বৃষ্টির জল পাড়ের চারপাশের মাটি থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে নিয়ে এসে জমা করেছে।

দ্বিতীয় আর একটি মত বর্তমানে খাড়া করেছে। এই মত অনুসারে সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে সহস্র সহস্র কিলোমিটার জুড়ে নরম আগ্নেয় শিলার স্তর। এই স্তরটি আবার স্থির হয়ে নেই। ঈষৎ বক্র গতিতে এবং অতি মন্থরভাবে চলমান।

নরম শিলাস্তরের সঙ্গে থাকে "জুভেনাইল ওয়াটার" নামে একধরণের জল। ঐ জলে থাকে ক্লোরিণ, ব্রোমিন, আয়োডিন, কারবন, বোরণ ইত্যাদি মৌল এবং ক্লোরিণ আয়ন ও হাইড্রোজেন আয়ন থাকার জন্য জলটি বেশ আম্লিক।

অপর দিকে শিলাস্তর চলমান হওয়ার জন্য ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন ঐ জল ফাটল পথে বেরিয়ে এসে সমুদ্রের জলে মেশে। সমুদ্র জলের সোডিয়াম আয়ন উক্ত জলের হাইড্রোজেন আয়নকে প্রতিস্থাপিত করে এবং গঠন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ।

সমুদ্রজলে মোট লবণের পরিমাণ কত তাও নির্ণয় করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে প্রথম রবার্ট বয়েলের পরীক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই সমুদ্র জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করেছিলেন এবং লবণের পরিমাণটাও নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে সমুদ্রজলে কেবলমাত্র খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকেনা, আরও অসংখ্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ মিশে আছে। তাই সোডিয়াম

ক্লোরাইডের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে।

অন্যদিকে প্রতিবছর সাগর জলে কতখানি নুন দ্রবীভূত হচ্ছে তাও নির্ণয় করা হয়েছে। সেই থেকে সাগরের বয়সটাও অনুমান করা হয়। কথিত আছে এ সম্বন্ধে প্রথমে আলোকপাত করেছিলেন এডমণ্ড হ্যালি। তিনি অবশ্য সমুদ্রের বয়স নির্ণয় করতে পারেননি। অনেক পরে নদীর দ্বারা বাহিত লবণের মাত্রা নির্ণয় করে সমুদ্রের বয়সটা হিসাব করা হয়েছে। এই হিসাবে সমুদ্রের বয়স ৩৮০ কোটি বছরের মত। তবে হিসাবটা একেবারে নিখুঁত নয়। অপরাপর পদ্ধতি—যেমন জীবাশ্মকে নিয়ে পরীক্ষা, ভূগর্ভে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে সীসার পরিমাণ নির্ণয়; ইত্যাদির মাধ্যমে যে বয়সটা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সঙ্গে মোটামুটিভাবে একটা মিল আছে বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা আবার পৃথিবীর বয়সটাও নির্ণয় করে নিয়েছেন। তাঁদের মতে পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর। এই হিসাব থেকে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর জন্ম থেকে সত্তর কোটি বছর বা আরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পৃথিবীর বুকে জল এসেছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রের। অবশ্য এটি নানা পরীক্ষা থেকে একটি অনুমান ছাড়া অন্য কিছু নয়। কালটা এমন বিরাট যে, এখানে লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছরেরও গরমিল হতে পারে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, সাগরের জল লোনা হলেও তীরভূমি থেকে মাঝসমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র সমান লবণাক্ত নয়। যে সব জায়গায় প্রচুর নদী এসে মিলিত হয়েছে এবং সব সময় মিঠে জল ঢালছে, সেখানে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করছে কেবল মিঠে জল। আমাজান নদীর মোহানা থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূর পর্যন্ত জল আদৌ লোনা হতে পারছেনা। অথবা সেখানকার জলে নুনের পরিমাণ অতি সামান্যই। কঙ্গো নদীর মোহানায়ও সেই একই অবস্থা।

নদী নেই, অথচ সাগরের উপকূলবর্তী কোন কোন অঞ্চলের জল লবণাক্ত নয়—এমন দৃষ্টান্তও আছে। যদিও এমন ঘটনা খুবই বিরল।

কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, বৃষ্টির জল অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের মাটি ভেদ করে তলায় নেমে যায়। তলায় যদি অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে তাহলে বৃষ্টির জলটা আর নিচে নামতে পারে না, সেই শিলাস্তরের উপর জমতে থাকে। সাগরের উপকূলভাগে এমনই যদি অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে এবং ঐ শিলাস্তরটি ক্রমশ ঢালু হয়ে সাগর তলা পর্যন্ত নেমে যায় তাহলে বৃষ্টির দ্বারা সঞ্চিত জলও নেমে পড়ে সাগর তলায় এবং ফোয়ারার আকারে উপরে উঠে। কিন্তু সাগর জলে নানা ধরণের লবণ দ্রবীভূত থাকায় বৃষ্টির জল অপেক্ষা ঘনত্ব অনেক বেশী। তাই লোনা জলের সঙ্গে সেই মিঠে জল হঠাৎ মিশতে পারে না। অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরে ভেসে ওঠে বেশ কিছু মিঠে জল। তাই উপকূলভাগের কোন কোন জায়গায় এক একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাজ করছে কেবল মিঠে জল। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার উপকূলে এই ধরণের মিঠে জল দেখা যায়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপকূলভাগ ছাড়া মাঝ সমুদ্রের দিকে জল লোনাই। বা উপকূল থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকলে জলে নুনের পরিমাণ বাড়ছে বলে মনে হবে। তবে এও সত্য যে, সব সাগর ও মহাসাগরের জল সমান লবণাক্ত নয়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, সমুদ্র জলের লবণের পরিমাণটা বাষ্পীভবনের উপর নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উপর সারা বছর প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এখানকার আবহাওয়াও বেশ আর্দ্র। তাই বাষ্পীভবনের হার বেশ মন্থর। উক্ত কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত।

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলে খুব কম নদী সাগরে এসে মিলিত হয়েছে। উক্ত অঞ্চলদ্বয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশী নয়। আর ঐ কারণেই স্থলভাগ হয় মরু অঞ্চল নয়ত মরুপ্রায় অঞ্চল। একদিকে যেমন উষ্ণতা অধিক অপরদিকে তেমনই বছরের অধিকাংশ সময় শুষ্ক আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। তাই কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলে সাগরপৃষ্ঠে জলের বাষ্পীভবনের হার বেশ দ্রুত। ফলে এই দুই অঞ্চলের সাগর জল নিরক্ষীয় অঞ্চল অপেক্ষা বেশ লবণাক্ত।

পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের সাগর জল আবার নিরক্ষীয় অঞ্চল অপেক্ষাও কম লবণাক্ত। মেরুদ্বয়ে প্রচণ্ড শীত। একটানা ছ মাস ধরে রাত এবং ছ্ মাস ধরে দিন। দিনের বেলায় সূর্য আবার কখনও মাথার উপর আসে না। দিগন্ত ছেড়ে একটু উপরে উঠতে উঠতেই তিনমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর অস্তমিত হতে আরম্ভ করে। অনুরূপ অবস্থায় যে সময়টা আকাশে সূর্য থাকে সে সময়েও শীত বড় কম নয়। জল জমে পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত হয়ে আছে। দিনের শুরু হলে কিছু কিছু বরফ গলে গিয়ে সাগর জলের সঙ্গে মেশে এবং বড় বড় বরফের চাঁই ধসের আকারে হিমবাহ রূপে ছুটে চলে সাগরের দিকে। হিমবাহের সংখ্যাও বড় কম নয়। অনেক সময় মালার আকারে সাগরে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায় এবং এদের গলনে প্রচুর মিঠে জল সাগরগুলো লাভ করে। অপরদিকে অত্যধিক শৈত্যের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের সাগর জলের বাষ্পীভবনের হার ও বেশ কম।

সাগর জলের নুনের গড় পরিমাণ ২৫%। তবে এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে। শতকরা হারের চিহ্নে প্রকাশ করলেও একশ এর পরিবর্তে এক হাজারেই বোঝায়। অর্থাৎ ২৫% কথাটি ব্যবহার করলেও একশ গ্রাম জলে ২৫ গ্রাম লবণ বোঝায় না। এক হাজার গ্রামেই ২৫ গ্রাম লবণ বোঝায়। ঐ হিসাবে নিরক্ষ অঞ্চলে লবণের পরিমাণ ৩৫%, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলে ৩৭% এবং মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে ৩৪%।

আংশিক স্থলবেষ্টিত সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে আবার লবণের পরিমাণ অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ, ভূমধ্যসাগরের জলের লবণতা ৪০%। স্থলবেষ্টিত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত সাগরের মত এখানকার জল সঞ্চালিত হতে পারছেনা। অপরদিকে এখানে বড় বড় নদী এসে মিলিত হতে পারেনি এবং বাষ্পীভবনের হারও বেশ দ্রুত।

ভূমধ্যসাগরের বিপরীত বাল্‌টিক সাগরের জল। এখানকার জলের লবণতা মাত্র ১১%। সবসময় প্রচণ্ড শৈত্য বিরাজ করায় এবং বরফ গলা জলে পুষ্ট বহু নদী মিলিত হওয়ায় বাল্‌টিক সাগরের জলের লবণতা

এত কম। এবং উক্ত কারণগুলির জন্য কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের জলও বাল্‌টিক সাগরের মত কম লবণাক্ত।

কিন্তু মরু অঞ্চলের হ্রদ সমূহের জলের লবণতার পরিমাণ বড় ভয়ানক। যেহেতু মরু অঞ্চল একেবারে শুষ্ক অঞ্চল, বৃষ্টিপাত হয়না বললেও চলে এবং কোন নদীও এখানে এসে মিলিত হতে পারেনি। অথচ জল সব সময় বাষ্পীভূত হতেই আছে। শুধু কালেভদ্রে যতটুকু বৃষ্টি হয় সেইটুকুকে বক্ষে ধারণ করে লবণতার তীব্র জ্বালাকে এক একটু প্রশমিত করে মাত্র। তাই মরু অঞ্চলের হ্রদগুলির জলের লবণতা ধীরে ধীরে বাড়তেই আছে।

পৃথিবীতে যত হ্রদ আছে তাদের মধ্যে এশিয়া মাইনরের ভ্যান হ্রদের লবণতার পরিমাণই সর্বাধিক; প্রায় ৩৩০% মত। অর্থাৎ হাজার গ্রাম জলে প্রায় ৩৩০ গ্রাম লবণ দ্রবীভূত হয়ে আছে। ভ্যান হ্রদের পরেই মরু সাগরের স্থান। মরু সাগরের জলের লবণক্তা ২৩৮%।

ভ্যান হ্রদ ও মরু সাগরের জলে লবণ এত বেশী যে, এই সব হ্রদে মানুষ পড়ে গেলেও ডুবে মারা যাওয়ার ভয় নেই। সাঁতার না জানা লোকও অক্লেশে ভেসে বেড়াতে পারে। এমন আশ্চর্য সে সব জলাধার।

## সাগর জলে দ্রবীভূত পদার্থ

প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভোয়সিয়র সমুদ্রজলে দ্রবীভূত পদার্থসমূহকে বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আংশিক পাতনের দ্বারা সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কারবনেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রভৃতি ধাতব লবণগুলির অস্তিত্বও প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, সমুদ্রজলে প্রায় ৫৪ রকমের লবণ মিশ্রিত আছে।

ল্যাভোয়সিয়ারের পরে আরও অনেকে সমুদ্রজলকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং এখনও গবেষণার বিরাম নেই বলা চলে। জানা গেছে, প্রায় ৬৫ রকমের মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত আছে সাগর জলে। তবে সর্বাধিক যে পদার্থটি মিশে আছে সেটি সোডিয়ামের এক যৌগ সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণ। সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া প্রধান প্রধান ধাতব যৌগগুলি যথাক্রমে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম সালফেট। এরা সরাসরি ভূপৃষ্ঠ থেকে বর্ষার জলে দ্রবীভূত হয়ে নদীর মাধ্যমে সাগরে এসে জমা হয়েছে।

পরিমাণের দিক থেকে উপরোক্ত ধাতব লবণের পরে ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট ও ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটের স্থান। এরা কিন্তু সরাসরি ভূপৃষ্ঠ থেকে সাগর জলে আসতে পারেনি। একটু ঘুরপাক খেয়ে অন্যভাবে জমেছে সাগর জলে।

সবারই জানা আছে যে, বাতাসের প্রধান প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে কারবন ডাই-অক্সাইডও একটি। বৃষ্টির ধারা যখন বায়ুস্তর ভেদ করে মাটিতে নামে সঙ্গে করে কিছু কিছু কারবন ডাই-অক্সাইডকে। কারণ, কারবন ডাই-অক্সাইড জলে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় না হলেও অল্পস্বল্প

দ্রবীভূত হয়। কারবণ ডাই অক্সাইডযুক্ত সেই জল ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়ার সময় মাটির ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং উৎপাদন করে দুই ধাতুর বাই-কারবনেট লবণ। উক্ত লবণগুলি আবার জলে ভালভাবে দ্রবীভূত হতে পারে। তাই বৃষ্টির জলের দ্বারা পরোক্ষভাবে বাইকারবনেট লবণগুলি সংগৃহীত হয়ে জমা পড়ছে সাগরে।

সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের উপরোক্ত লবণগুলি ব্যতীত অল্প পরিমাণে যে সব ধাতব লবণ মিশ্রিত থাকে তাদের মধ্যে তামা, সীসা, নিকেল, লোহা, বেরিয়াম, কোবাল্ট ও দস্তার লবণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও থাকে সোনা ও রূপার মত মূল্যবান ধাতুর লবণ, রেডিয়াম ও ইউরেনিয়ামের মত তেজস্ক্রিয় ধাতুর লবণ, ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য অধাতুর মধ্যে থাকে ব্রোমিন, আয়োডিন, সালফার ও ফসফরাস। আরও জানা গেছে সমুদ্রজলে অতি অল্প পরিমাণে ভারী জলের অণুও আছে।

সাগরজল থেকে সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইডকেই ব্যাপকভাবে নিষ্কাশন করা হলেও যে সব মূল্যবান ও তেজস্ক্রিয় ধাতু সাগর জলে মিশে আছে তাদের পৃথক করা সহজসাধ্য নয়। যদিও সমুদ্রজল থেকে ওদের নিষ্কাশন পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গেছে তবু পরিমাণে ওরা এত কম যে, নিষ্কাশন করলে আদৌ খরচে পোষাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সমুদ্রজলে প্রতি ঘন মাইলে সোনা থাকে মাত্র ১৭½ কিলোগ্রামের মত। অতএব ঐ ১৭½ কিলোগ্রাম সোনাকে উদ্ধার করতে এক ঘন মাইল জলকে শোধন করতে হবে। অতএব খরচে পোষাবে কেমন করে? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবীর জলভাগ সমূহে সোনার পরিমাণটাও নেহাৎ কম নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে সাগর মহাসাগর সমূহে শুধু সোনারই পরিমাণ তেষট্টি লক্ষ পঁচিশ হাজার টন। অতএব সমুদ্র যে রত্নাকর— সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাগর জলে ইউরেনিয়াম ও রেডিয়ামের মত তেজস্ক্রিয় ধাতুর লবণ

অবশ্য নিতান্তই কম। তবু সামগ্রিকভাবে হিসেব করলে অঙ্কটা খুব কম দাঁড়াবেনা। কিন্তু ইউরেনিয়াম কিংবা রেডিয়ামের লবণ অথবা ভারী জলের অণুকে পৃথক করার কোন সহজ পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে এর চাহিদা প্রচুর। মানুষ যদি সহজে এদের সমুদ্র জল থেকে পৃথক করতে পারতো তাহলে বর্তমান সভ্যতার একটা বড় চাহিদাকে পূরণ করতে পারতো। তবে রত্নাকর তার বুকের রত্নরাজিকে মায়ের বুকের সন্তানের মত এমন ভাবে আগলে রেখেছে যে, সে রত্নের কোন একটিকে সহজে ছিনিয়ে আনার কোন উপায় আজও পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি।

তবু বলতে হবে যে, সমুদ্রজল থেকে রত্নগুলিকে আহরণ করার জন্য মানুষ যত্নের কোন ত্রুটি করছে না। প্রায় সব দেশই সমুদ্রগর্ভ ও সমুদ্র জল থেকে রত্ন উদ্ধারের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তথাপি খাদ্য লবণ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ ছাড়া অন্যগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। ভবিষ্যতের উন্নত বিজ্ঞান মূল্যবান পদার্থগুলিকে যদি জল থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন করতে পারে তাহলে মানুষের বিরাট চাহিদাগুলির কিঞ্চিৎ পূরণ হবে।

সেই সঙ্গে একটা ভয়ও আছে। কোন দেশ যদি তার উন্নত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে রত্নগুলিকে সহজে নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয় তাহলে সে যে তার গবেষণাবলীকে একান্তভাবে গোপন রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং অতি সঙ্গোপনে তার আহরণের কাজ চালিয়েও যাবে। তাই সমুদ্র সম্বন্ধে গবেষণায় প্রত্যেকটি দেশেরই অংশগ্রহণ করা উচিত। সুখের কথা, আমাদের ভারতবর্ষ এবিষয়ে পেছিয়ে নেই। সমুদ্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্য উপকূল ভাগের বহু স্থানে গবেষণাগার তৈরী করেছে এবং নিয়োগ করেছে বহু বিজ্ঞানীকে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত অনেকগুলি জাহাজও নির্মাণ করেছে এবং সেগুলি নিয়মিতভাবে সাগরে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

## মহাসমুদ্রের গভীরতা

অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র। অর্থাৎ মহাসমুদ্রের তলদেশ এমনকি তার সীমাটাও কেউ স্পর্শ করে আসতে পারেনা—এমন একটা ধারণা গড়ে ওঠায় অনুরূপ নামকরণ। তবে আজকের দিনে সাগরের সীমাও নির্ধারিত হয়েছে এবং গভীর সমুদ্রের তলদেশও স্পর্শ করে এসেছে মানুষ। সমুদ্রে অজ্ঞাত স্থান আজ আর বড় একটা নেই।

মহাসাগর, সাগর প্রভৃতির তলাটা কিন্তু সর্বত্র সমতল নয়। পাহাড়, আগ্নেয়গিরি, শৈলশিরা গভীর খাত ইত্যাদি সব কিছুই আছে। আর আছে নিমজ্জিত দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ। অপরদিকে উপকূল-ভাগ থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় ততই তার গভীরতা বাড়তে থাকে। শেষে সমতল সাগরগর্ভ পাওয়া যায়।

সাগর গর্ভকে গ্রীষ্মের শুষ্ক নদীগর্ভ অথবা জলবিহীন কোন পুরাতন দিঘীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। যদিও এর বিশালতা এবং অকল্পনীয় গভীরতার সঙ্গে কারও তুলনা করা ঠিক হবেনা, তবুও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নদী কিংবা দিঘির জলে নেমে পাড় থেকে যত দূরে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ধীরে ধীরে গভীরতা বাড়তে থাকে। এক সময় একটা নির্দিষ্ট গভীরতার পর জলের উচ্চতা আর বাড়েনা তেমনই সমুদ্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। নদীতে যেমন মাঝে মাঝে সুগভীর এক একটি স্থান দেখা যায়, তেমনই সমুদ্রেও দৃষ্ট হয় গভীর খাত। সে সব খাতের এক একটি এত গভীর যে, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টও সম্পূর্ণ তলিয়ে যেতে পারে।

সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। তার উপর বায়ু যেমন স্বচ্ছ, তেমন জলটা স্বচ্ছ নয়। তাই সূর্য রশ্মি বায়ুকে ভেদ করে অক্লেশে পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পড়লেও গভীর জলরাশিকে ভেদ করে সাগর তলায় প্রবেশ করতে পারে না। ঐ কারণে সাগরতল ঘন অন্ধকারে-সমাচ্ছন্ন এবং অন্ধকারের

জন্যই সাগর তলাটা আজও মানুষের কাছে বিস্ময় ও রহস্যাবৃত থেকে গেছে।

মানুষের আবার রহস্য উদ্ঘাটনের প্রবণতা সহজাত। যেখানে সে রহস্য, ভয় অথবা বিস্ময়ের গন্ধ পায় সেখানেই তার মন ছুটে যায় সর্বাগ্রে। তাই সাগর গর্ভের রহস্য উদ্ঘাটনের কত প্রচেষ্টা, আর কত পরিকল্পনা! কত রকমের কত যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, বীর ডুবুরীরা তলায় নামছেন, তলার মাটিকে নিয়ে হরেক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, এমনই আরও কত কি! তাই বর্তমানে সাগরতলার রহস্য অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসার যে একেবারে নিরসন হয়েছে এমন নয়।

সাগরের গভীরতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। বিভক্ত করেছেন চারটি বিভাগে। বিভাগগুলি যথাক্রমে মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং সুগভীর সমুদ্র খাত।

মহী সোপান—মহাসাগর, সাগর, উপসাগর প্রভৃতির সূচনা দেশ কিংবা মহাদেশের প্রান্তভাগ থেকে। ঐ প্রান্ত দেশকেই আমরা উপকূলভাগ বলে থাকি। উপকূলভাগটা আবার ইটের দেওয়ালের মত সাগরের তলদেশ থেকে একেবারে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠেনি। ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাগর তলায়। ঢালটার প্রথম অংশকে বলা হয় মহীসোপান। এই ঢালটা সিঁড়ির ধাপের মত উপর থেকে অল্প অল্প করে নেমে গেছে তলার দিকে। তাই এই ধরণের নাম। উপকূল থেকে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গভীরতা হুট করে বেড়ে যাচ্ছে না। একটু একটু করে বাড়ছে মাত্র।

মহীঢাল—মহীসোপানের পরবর্তী অংশই মহীঢাল। উপকূল থেকে জল মাপতে মাপতে এগিয়ে গেলে কিছুদূরের পর গভীরতা যেন খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। এই অংশটা যেন সুউচ্চ পর্বত গাত্রের মত। অর্থাৎ ঢালটা যেন খাড়াভাবে নেমে গেছে তলার দিকে।

কোন দেশ কিংবা মহাদেশের প্রান্ত সীমা ঐ ঢাল যেখান থেকে শুরু সাধারণত সেইখান থেকেই ধরা হয়। অর্থাৎ পুরো মহীসোপানটাই দেশ-মহাদেশের প্রান্ত সীমার অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু মহীঢাল নয়।

গভীর সমুদ্রের সমভূমি—মহীঢালের যেইখানে শেষ, সেইখানেই শুরু সাগরতলের। এক মহীঢালের প্রান্তসীমা থেকে অপর মহীঢালের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ এলাকাকে নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের সমভূমি। অবশ্য সমভূমি অর্থে একেবারে খেলার মাঠের মত সুসমতল নয়। মাঝে মাঝে পাহাড় পর্বত, সুদীর্ঘ শৈলশিরা, গভীর খাত ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। তথাপি এলাকাটা এত বিশাল যে, তার কাছে উঁচু নিচু অংশগুলি কিছুই নয়। তাই ওকে সমতলই ধরা হয়। অপর-দিকে স্থলভাগে আমরা যেমন পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, গভীর হ্রদ প্রভৃতি দেখতে পাই তেমনই সাগর তলাটাও অনুরূপ বৈচিত্রে ভরা।

সুগভীর সমুদ্রখাত—সাগরতলায় সবচেয়ে আশ্চর্য—তার গভীর খাতগুলি। যেখানে সমুদ্রতলের গড় গভীরতাকে দু-তিন মাইলের মধ্যে ধরা হয়েছে সেখানে ঐ খাতগুলির একএকটির গভীরতা সাগরতলা থেকে তিন থেকে চার মাইলের মত। গবেষকদের মতে, ঐ খাতগুলির সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অথবা ভূমিকম্পের ফলে। আর ঐ কারণেই খাতগুলোকে মাঝসমুদ্রে দেখা যায় না। যত খাত সবই মহীঢালের পাশাপাশি অবস্থান করছে।

আজ পর্যন্ত বহু খাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। অনাবিষ্কৃত খাত ও হয়ত আছে। তবে আবিষ্কৃত খাতগুলির বেশীরভাগ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালত্ব যেমন অধিক তেমনই অধিক সংখ্যক তার খাত এবং খাতগুলির গভীরতাও বেশী। এখানে যত খাতের সন্ধান লাভ করা গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর "মেরিয়ানা" নামক খাতটি। এটিকে পৃথিবীর গভীরতম খাত ও বলা হয় এবং এর গভীরতা ৩৭৮০০ ফুট। এমন যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট—

তাকেও যদি এনে ঐ খাতে নিমজ্জিত করা হতো তাহলে সেটিও থাকতো ন হাজার ফুট জলের তলায়। খাতটি গুয়ামদ্বীপের দুশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে।

দ্বিতীয় গভীরতম খাতটিও প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এই খাতটির নাম এমডেন খাত। ৩৫৪০০ ফুট গভীর উক্ত খাতটি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের একেবারে কাছেই রয়েছে। এভারেষ্টকে যদি এমডেন খাতে নিমজ্জিত করা হয় তাহলে সেটি প্রায় সাড়ে ছ হাজার ফুট তলায় তলিয়ে যেতো।

প্রশান্ত মহাসাগরের অপরাপর খাতগুলির মধ্যে পশ্চিম প্রান্তে চ্যালেঞ্জার খাত, অ্যালুসিয়ান খাত এবং আটাকামা খাত বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের খাতগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের খাতগুলির মত তত গভীর নয় এবং সংখ্যায়ও বেশী নয়। এই দুই মহাসাগরের তলদেশ বেশ সমতল ও দীর্ঘায়ত—প্রশান্ত মহাসাগরের মত এত ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক নয়।

উপরোক্ত দুই মহাসাগরের খাতগুলির মধ্যে ব্লেক খাত, স্যাণ্ডউইচ খাত ও সুণ্ডা খাতই প্রধান। সুণ্ডা খাত ভারত মহাসাগরের খাত এবং এটি অবস্থান করছে জাভা দ্বীপের দক্ষিণে। আটলান্টিক মহাসাগরে পোর্টোরিকোর কাছে ব্লেক খাত এবং স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ খাত অবস্থিত।

মহাসাগরগুলিতে গভীর খাত থাকলেও মহাসাগরের গভীরতা কিন্তু খাতের তলদেশ পর্যন্ত ধরা হয়না। মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর-খাত—সবকিছুকে গড় করে যে গভীরতা পাওয়া যায় তাকেই ধরা হয় গভীরতা। উপকূল থেকে গভীরতা অল্পে অল্পে বাড়তে বাড়তে মহীসোপানের শেষ প্রান্তে গভীরতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ ফুটের কাছাকাছি। তারপর নেমেছে মহীঢাল এবং সর্বশেষে বিস্তীর্ণ সাগর-তল। তাছাড়াও আছে গভীর খাতসমূহ। এদের সবকিছুর গড় নিলে গভীরতা হয় প্রায় ১২০০ ফুটের মত।

বর্তমানে সাগরের গভীরতা নির্ণয় করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। আগে নাবিকেরা সমুদ্রের গভীরতা মাপার জন্য জাহাজ থেকে দড়িতে অথবা লোহার তারে কোন কিছু ভারী বস্তুকে ঝুলিয়ে তলায় নামাতেন। অনেকসময় ডুবুরীরাও জলের তলায় নেমে গভীরতা মাপতেন। কিন্তু খুব গভীরে ডুবুরীদের নামার অনেক বিপদ আছে। বিশেষত নিচের দিকে জলের চাপ অতি ভয়ঙ্কর এবং জলও ভয়ানক ঠাণ্ডা। তাছাড়া সূর্যরশ্মি জলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে তলা থেকে প্রতিফলিত হতে পারে না বলে চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারও। কোন অমবস্যার মধ্য-রাত্রিতে সারা আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে যে আঁধার নেমে আসে সাগরতলা তার চেয়েও অন্ধকার। তাই তলায় না নেমে যন্ত্রের দ্বারা অতি সহজে গভীরতা নির্ণয় করে নেওয়া হয়। এই কাজটি সম্পন্ন করে হাইড্রোফোন নামের একটি যন্ত্র। সাধারণত জলের অল্প গভীরে একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের শব্দ এবং সেই শব্দ তলায় প্রতিফলিত হয়ে যখন প্রতিধ্বনির আকারে ফিরে আসে তখন সেই প্রতিধ্বণি দুটিই লিপিবদ্ধ হয় হাইড্রোফোনে। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান জানা যায় এবং জলে শব্দের গতিবেগও জানা আছে। তাই গভীরতা নির্ণয়ে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু অনুরূপ পদ্ধতিতে ত্রুটি আছে। তার কারণ, জলে শব্দের বেগ সাধারণত সেকেণ্ডে ৪৭০০ ফুট বা ১৫২০ মিটার ধরা হলেও সমুদ্রের তলার দিকে জলের তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকায় শব্দের বেগও কমতে থাকে। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট গভীরতার ধ্বনিটি পৌঁছলে বেঁকে উর্ধ্বমুখী হতে আরম্ভ করে কিন্তু তলা স্পর্শ করে না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্য বর্তমানে যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই শব্দ তরঙ্গকে প্রেরণ করা হয় সাগরের তলদেশে। উক্ত তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা বিক্ষিপ্ত হয় না কিংবা মাধ্যম দ্বারা শোষিতও হয়না। সোজা তলায় নেমে গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। তখন ধরা পড়ে যন্ত্রের বৈদ্যুতিক টেলিফোনে। অপর দিকে যাওয়া আসায় কত সময় ব্যয়িত হয়েছে

তাও ধরা পড়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে। যত সেকেণ্ড সময় ব্যয়িত হয়েছে সেই সংখ্যাটির দ্বারা গুণ করা হয় জলে শব্দতরঙ্গের গতিবেগের সঙ্গে। গুণফলের অর্ধেক নিলেই প্রকৃত গভীরতা লাভ করা যায়। অর্ধেক নেওয়ার কারণ, শব্দতরঙ্গকে একবার তলায় যেতে এবং তলা থেকে উপরে ফিরে আসতে মোট দূরত্বের দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করতে হয়।

বর্তমানে আবার যন্ত্রগণকের অভাবনীয় উন্নতির ফলে ওসবের কিছুই গণনা করতে হয় না। যন্ত্রগণকই সব ঠিকঠাক করে দেয়। মানুষের বরং ভুল হতে পারে কিন্তু যন্ত্রের দ্বারা ভুল সম্ভব নয়। তাই একেবারে নিখুঁত ভাবেই নির্ণয় করে নেওয়া হয় সমুদ্রের গভীরতা।

জল সবদিকেই চাপ দেয়। আবার গভীর জলের তলায় ডুব দিতে গেলে জলের নিম্নচাপ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে। যেহেতু সমুদ্র অত্যন্ত গভীর, তাই তার তলদেশে শত শত ফুট উচ্চ জলস্তরের ভয়ঙ্কর চাপ। উপর দেখে যতই নিম্নে অবতরণ করা যায় ততই চাপটা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে অনুভূত হয়। সমুদ্র জলে আবার নানাপ্রকার লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নদী-জলাশয়ের স্বাদু জল অপেক্ষা বেশী। সেই কারণে স্বাদুজল অপেক্ষা সমুদ্র জল আরও বেশী চাপ প্রদান করে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সাগরে মাত্র ৩৩ ফুট গভীরে প্রতি বর্গঞ্চিতে চাপ পড়ে ৬$\frac{২}{৩}$ কিলোগ্রাম। তাঁরা আরও প্রমাণ করেছেন, প্রতি তেত্রিশফুট গভীরতায় প্রতি বর্গইঞ্চিতে ঐ একই হারে চাপ বেড়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ তেত্রিশফুট গভীরতায় ৬$\frac{২}{৩}$ কি. গ্রা, ৬৬ ফুটগভীরতায় ৬$\frac{২}{৩}$ × ২ কি. গ্রা., বা ১৩$\frac{১}{৩}$ কি. গ্রা., ৯৯ ফুট গভীরতায় ৬$\frac{২}{৩}$ × ৩ কি. গ্রা. বা ২০ কি. গ্রা, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে চাপ বাড়তে বাড়তে মাত্র একমাইল গভীরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাগর জলের চাপ ১০৬৬ কি.গ্রার মত। অর্থাৎ এক কুইন্ট্যালেরও বেশী। অতএব কেউ যদি সাগর জলের মাত্র এক মাইল গভীরে নামে তাহলে তার উপর চাপ পড়বে প্রায় ২৩ টনেরও বেশী। কারণ, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহের ক্ষেত্রফল সাধারণত ১৬ বর্গফুট বা ২৩০৪ বর্গ ইঞ্চি। অতএব গভীর সমুদ্রের তলদেশে নামতে গেলে কি ভয়ঙ্কর যে চাপ তা সহজে অনুমান করা যায়।

ঐ ভয়ঙ্কর চাপের জন্য মানুষের পক্ষে সাগর তলায় নামা খুব সহজ নয়। তবে বুদ্ধিমান মানুষের কাছে অসাধ্য আজ কিছু নেই বলা চলে। তারা বিশেষ বিশেষ পোষাকে সজ্জিত হয়ে কিংবা

বিশেষ ধরণের চাপ নিরোধক কক্ষে আবদ্ধ হয়ে সাগরের তলদেশ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের পোষাকও চাপ নিরোধ এবং বায়ু যন্ত্রপাতি সমন্বিত।

তবে এও সত্য যে, একশ ফুট থেকে দেড়শ ফুট গভীরে নামতে ডুবুরীদের কোন অসুবিধা হয় না। এই অবস্থায় জলনিরোধক সাধারণ পোষাক হলেই চলে। তবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এবং এই ব্যবস্থার জন্য অক্সিজেন সিলিণ্ডারকে বহন করে নিয়ে যেতে হয় অথবা মুখে যে মুখোসটা পরে, সেই মুখোসের সঙ্গে যুক্ত নলের সাহায্যে উপর থেকে বাতাস কিংবা অক্সিজেন গ্রহণ করে। মুক্তা অনুসন্ধানকারী ডুবুরীরা সাধারণত অনুরূপ গভীরতায় নামে। জাহাজ থেকে তাদের নামিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে করে অক্সিজেনের সিলিণ্ডারকে। ফলে দীর্ঘসময় সাগর তলায় কাটাতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

দেড়শ ফুটের বেশী গভীরে নামতে হলে অন্যধরনের পোষাকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সাধারণত ডুবুরীদের এক বিশেষ ধরণের ইস্পাতের তৈরি কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হতে হয়। ওকে এক ধরণের খাঁচা বললেও অত্যুক্তি হয় না। খাঁচার ভেতরে থাকে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা এবং নানা ধরণের যান্ত্রিক সরঞ্জাম। চাপ নিরোধক এই খাঁচাটি থেকে তীব্র আলোক ফেলে গবাক্ষপথে সাগর তলা দেখতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অপরদিকে ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তু থেকেও রক্ষা করে। কখনও কখনও ডুবুরীরা আবার জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষার সরঞ্জামও বহন করে।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে নামার জন্য উপযুক্ত পোষাক এবং কাঠামো প্রথম তৈরি করেছিলেন উইলিয়ম বীব। তাঁর তৈরি যন্ত্রপাতি সমন্বিত সাগর তলায় অবতরণের যানটিকে বলা হয় ব্যাথিস্ফীয়ার। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে বীব স্বয়ং কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে ৩০২৮ ফুট জলের তলায় নেমেছিলেন এবং সেখানে সাগরজলের চাপটাও মেপেছিলেন। সেই প্রথম জানা যায়, ৩০০০ ফুট গভীরে সাগর জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে ছ কুইন্ট্যালের মত।

উইলিয়ম বিবের পরেও অনেকে অনেক রকমের পোষাক এবং জলের তলায় নির্বিঘ্নে অবতরণের উপযোগী বিশেষ বিশেষ সরঞ্জাম নির্মান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পিকার্ডের তৈরি ব্যাথিস্কোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাথিস্কোপে করে পিকার্ডের ছেলে ৩৫৮০০ ফুট গভীরে নেমেছিলেন। বর্তমানে আরও তলায় সুগভীর খাত সমূহেও অনেকে আবতরণ করেছেন। তবে পোষাক নির্মান এবং তলদেশে নামার জন্য গবেষণা এখনও অব্যাহত আছে।

সাগর তলায় অবতরণের ক্ষেত্রে জলের ভয়ঙ্কর চাপ যেমন একটি বড় বাধা, তেমনই আর একটি বাধা হচ্ছে সমুদ্রের গভীরে নিম্ন তাপমাত্রা। একটা মজার কথা, পৃথিবীর বৃহত্তম জলভাগসমূহের সঙ্গে পরস্পর সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সাগরপৃষ্ঠে সব জায়গায় জলের উচ্চতাও সমান নয়। দেখা গেছে, নিরক্ষঅঞ্চলে উষ্ণতা প্রায় ৮০° ফারেনহাইট বা ২৬·৬° সেলসিয়াস। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলের উষ্ণতা আরও বেশী। কিন্তু মেরুর দিকে ক্রমশ কমতে কমতে উষ্ণতা—৩·৫° সেলসিয়াসে নেমে গেছে।

সাগরপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ গভীরেও তাপমাত্রা একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। তবে দেখা গেছে সাগরপৃষ্ঠ থেকে ১০০ ফুট গভীর পর্যন্ত জলের তাপমাত্রা পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রার প্রায় সমান। তারপরেই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করেছে। এই ভাবে কমতে কমতে প্রায় দেড়হাজার ফুট গভীরে জল যেন একেবারে হিমশীতল। তাই বলে তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াসে নেমে বরফ হতে পারেনি। উপর থেকে তাপমাত্রা কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় স্থির হয়ে গেছে এবং সেই স্থির তাপমাত্রা একেবারে তলদেশেও দেখা যায়।

স্থির তাপমাত্রাটি ৪° সেলসিয়াস। জলের একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, সে কোন তাপমাত্রার জল অপেক্ষা ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রার জল সবচেয়ে ভারী। অপরদিকে সব তরলের মতই ঠাণ্ডা জল গরম জল অপেক্ষা ভারী। যখন সাগর পৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়ে তখন পরিচলনের ফলে উপরের উষ্ণ জল তলায় নামতে পারে না। তলায় ঠাণ্ডা জল

ঠিকই থেকে যাচ্ছে। অপরদিকে মেরুদেশে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লে পৃষ্ঠদেশের ঠাণ্ডা জল পরিচলনের ফলে তলার দিকে নেমে আসে এবং তলার জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও হালকা হওয়ায় উপরে উঠে আসে। এইভাবে একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হওয়ায় জল ধীরে ধীরে তাপমাত্রা হারায়। যখন উপরের তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াসে নেমে আসে তখন সে জল ভারী বলে তলায় নেমে যায় বটে কিন্তু আর উপরে উঠতে পারে না। অথচ উপরের জল তাপ হারাতে হারাতে এক সময় ০° সেলসিয়াসে এসে বরফে পরিণত হয়ে যায়। উক্ত কারণে মেরুদেশে পর্যন্তও সাগরপৃষ্ঠ বরফে আচ্ছাদিত হয়ে পড়লেও তলায় থাকে ৪° সেলসিয়াসের জল।

অতএব সাগর তলায় একটা নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে তাপমাত্রা যে স্থির থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরের জল দিনের বেলায় সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয় এবং রাত্রিবেলায় আকাশে সূর্য না থাকায় তাপ হারাতে থাকে। তাই নিম্নে স্থির তাপমাত্রার জল আর উপরের জল এই দু-য়ের মাঝে বিশেষ একটি স্তর আছে। ঐ স্তরের তাপমাত্রা সবসময় পরিবর্তনই হতে আছে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয় যে, আপতত সমুদ্রতলের বিশেষ একটা গভীরতা থেকে তলার দিকে তাপমাত্রা স্থির থাকলেও মাঝে মাঝে উষ্ণ ও শীতল জলের প্রবাহের ফলে কোথাও কোথাও তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে। ডাঙায় যেমন বুকে অজস্র জল নিয়ে নদীগুলো ছুটে চলেছে সাগরে, তেমনই সাগর গর্ভেও নদীর মতই প্রবাহ আছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন, ডাঙায় নদীগুলি একত্রে গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২০ লক্ষ টনের মত জল ঢালছে সাগরে। অথচ সাগর তলায় এমন সব প্রবাহ আছে যারা প্রতি সেকেণ্ডে দশ কোটি টন জলকে নিয়ে কেবল ছুটতেই আছে।

সাগর তলায় প্রবাহগুলির গতিবেগ এবং উষ্ণতা সবার সমান নয়। ওদের কেউ ছুটছে শীতল জলকে নিয়ে, আবার কেউ ছুটছে উষ্ণ জল বহন করে। মাঝে মাঝে মগ্ন শৈলশিরা আবার তাদের বাধা প্রদান

করছে। তার ফলেও তারতম্য হচ্ছে উষ্ণতার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উত্তর-আফ্রিকা ও জিব্রাল্টারের মধ্যে মগ্ন শৈলশিরা থাকায় আটলান্টিকের শীতল জলপ্রবাহ ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ করতে পারছেনা। তাই একই গভীরতায় ভূমধ্যসাগরের জলের তাপমাত্রা আটলান্টিকের তাপমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ২০° সেলসিয়াস অধিক। আর ঐ একই কারণে সমান গভীরতায় লোহিত সাগরের জল অপেক্ষা ভারত মহাসাগরের জল অধিক উষ্ণ।

## সমুদ্র স্রোত ও বায়ুপ্রবাহ

ডাঙার উপাদান কঠিন পদার্থ—তথা মাটি। সেই মাটিকে অবলম্বন করে জন্মেছে গাছপালা। ওরা উভয়েই স্থির; অধিকন্তু গাছপালা আবার মাটিকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করছে। অপরদিকে ডাঙার জীবজগতের আছে নিজস্ব চলৎশক্তি। এবং ঐ শক্তির প্রভাবেই তারা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে পারে।

মাটি জড় পদার্থ ও কঠিন। পৃথিবীর নৈসর্গিক প্রভাবগুলো তাকে ক্ষয় করে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাহিত করে, তবু তার ক্ষয় রোধের জন্য কতকগুলি বিপরীত শক্তি কাজ করে থাকে। তাই বিশাল পৃথিবীতে যে পরিমাণ ডাঙা আছে তার ক্ষয় হচ্ছে সত্য কিন্তু সে ক্ষয় নিতান্তই তুচ্ছ বলা যেতে পারে। কিন্তু জল তো কঠিন পদার্থ নয়, সে তরল। স্বভাবতই এর গড়ানে ধর্ম বিদ্যমান এবং কোন প্রভাব ব্যতীত অনুকূল পরিবেশে সে আপনিই গড়িয়ে চলতে পারে। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই।

মহাসাগরগুলিকে যদি এক একটি আধার হিসাবে কল্পনা করা যায়, তাহলেই তার বুকের জলরাশিকে স্থির হয়ে আছে ধরতে হয়। কিন্তু তাতো হবার নয়! স্থলভাগের মত মহাসাগরের বুকেও আছে নানা নৈসর্গিক প্রভাব। সেইসব প্রভাবের ফলে মহাসাগরের জলের স্থির হয়ে থাকার কোন উপায় নেই। জলকে একরকম নিয়মিত-ভাবেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হতে হচ্ছে। আর প্রবাহের সেই গতিকেই বলা হয় সমুদ্রস্রোত।

সমুদ্রস্রোতের জন্য নিয়ত বায়ুপ্রবাহ একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেহেতু সারা বছর ধরে নিয়মিতভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট দিকে উক্ত বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয় তাই অনুরূপ নামকরণ।

নিয়ত বায়ুপ্রবাহ তিন ধরণের। আয়নবায়ু, পশ্চিমাবায়ু এবং মেরু

বায়ু। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। তাই উক্ত অঞ্চলের জলভাগের উপরিস্থিত বায়ু গরম হয়ে ওঠে। আবার যেহেতু উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা হালকা, ফলে, উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে যায় এবং চারদিকের শীতল ও ভারী বায়ু তার স্থান দখল করার জন্য ছুটে আসে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে উপরোক্ত ব্যাপারটা সারা বছর ধরেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ সারা বছরই বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং নিকটবর্তী কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপযুক্ত বায়ু তথা শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে নিয়মিতভাবেই ছুটে আসে। অপরদিকে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলে সূর্য সব সময় তির্যকভাবে কিরণ দেওয়ার জন্য উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের জলভাগের উপরিস্থিত বায়ু ততখানি উষ্ণ হতে পারে না।

এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় আয়নবায়ু। অনুরূপ নামকরণের একটা বিশেষ কারণ আছে। আয়নের অপর নাম বাণিজ্য। আগেকার দিনে পালতোলা জাহাজগুলো এই বায়ুপ্রবাহের দ্বারা একটা নির্দিষ্ট দিকে চালিত হতো। তাই সেদিনের নাবিকেরাই এর নামকরণ করেছিলেন আয়নবায়ু। কেবল নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে নয়, কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিম্নচাপ বলয়ের দিকেও দুটি প্রবাহ সারা বছর ধরে একটা নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হচ্ছে। এরা আয়নবায়ুর মত ততখানি নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় না এবং এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ।

উত্তর গোলার্ধে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ বেশী। আর স্থলভাগ বেশী হওয়ার জন্য পাহাড় পর্বতের সংখ্যাও বেশী। ফলে পশ্চিমা বায়ু উত্তর গোলার্ধে প্রবাহিত হওয়ার সময় তার প্রবাহের দিক ও গতি দুইই পরিবর্তিত হয়ে যায়। অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ অধিক এবং স্থলভাগ কম। তাই সারাবছর ধরে এই প্রবাহ প্রবলবেগে দক্ষিণ গোলার্ধের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। উক্ত প্রবল বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ গোলার্ধে গর্জনশীল চল্লিশা নামে খ্যাত।

উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতেও বায়ু শীতল ও ভারী। সেখানকার উচ্চচাপ বলয় থেকে দুটি শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় মেরুবায়ু। উক্ত প্রবাহের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে সমুদ্রের উপর মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে এবং প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়।

মহাসাগরগুলিতে নিয়ত বায়ুপ্রবাহগুলি প্রবাহিত হওয়ার ফলে সমুদ্রের উপরিভাগের জলরাশিও আন্দোলিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট দিকে জল সর্বদাই পরিচালিত হয়। ফলে উৎপন্ন হয় এক ধরণের সমুদ্রস্রোত। যেহেতু সাগরপৃষ্ঠে জলরাশির আন্দোলনের ফলে উক্ত স্রোত উৎপন্ন হয়, তাই এই স্রোতকে বলা হয় বহিঃস্রোত বা "সারফেস কারেন্ট"।

অপরদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রখর সূর্যকিরণের জন্য সমুদ্রের উপরিস্থিত জল যথেষ্ট পরিমাণে বাষ্পায়িত হওয়ায় জলশূন্যতারও সৃষ্টি করে। তার উপর নিয়ত বায়ুপ্রবাহের দ্বারা উৎপন্ন বহিঃস্রোত মেরুর দিকেও ছুটে চলেছে। ফলে গ্রীষ্মমণ্ডলের জলভাগগুলিতে আরও শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। তখন ঐ শূন্যস্থান দখলের জন্য প্রবাহের আকারে ছুটে আসছে মেরুপ্রদেশের শীতল জল। কিন্তু এই শীতল জলপ্রবাহ উপর দিয়ে ছুটে আসতে পারছে না—আসছে সাগর মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে। সেই কারণেই অনুরূপ স্রোতের নাম অন্তঃস্রোত বা "আনডার কারেন্ট"।

সাগরবক্ষে যে দুধরনের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তারা সম্পূর্ণরূপে বাধাহীন নয়। মাঝে মাঝে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। প্রধান বাধাগুলি পৃথিবীর আকর্ষণ বল এবং স্থলভাগের আকৃতি।

পৃথিবীর আকর্ষণবল একটা বড় বাধা। তার উপর পৃথিবীর স্থলভাগটা আবার এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। অনেক জায়গায় যেমন স্থলভাগ কোথাও কোথাও সরু হয়ে সাগরের দিকে ঝুলে পড়েছে অপরদিকে তেমনই বহু বিস্তীর্ণ জলভাগ ঢুকে পড়েছে স্থলভাগের ভেতরেই। তাছাড়া সাগর মহাসাগরে অবস্থান করেছে বহু সংখ্যক দ্বীপ, ভগ্ন চড়া,

শৈলশিরা, আগ্নেয় পাহাড় ইত্যাদি কত কি! ঐ বাধাগুলির জন্যই বহিঃস্রোত ও অন্তঃস্রোত দুধরনের স্রোতেরই গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে।

বিভিন্ন মহাসাগরে যে সমস্ত স্রোতগুলি প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সর্বাধিক স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে। এখানকার স্রোতগুলি আবার বড় বিচিত্রও। তাই প্রথমে আটলান্টিক মহাসাগরের কথা স্রোতগুলির উল্লেখ করা গেল। উক্ত মহাসাগরে প্রবাহিত স্রোতগুলির মধ্যে প্রধান বেঙ্গুয়েলা স্রোত, উত্তর ও দক্ষিণ ব্রেজিল স্রোত, নিরক্ষীয় স্রোত, উপসাগরীয় স্রোত ও ল্যাব্রাডর স্রোত।

বেঙ্গুয়েলা স্রোত—স্রোতটির উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ মহাসাগর বা কুমেরু মহাসাগর। এই স্রোতটি শীতল এবং এটি পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বেঁকে আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে উপকূলভাগে প্রতিহত হয়ে প্রবেশ করছে আটলান্টিক মহাসাগরে।

উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত—দুটিরই উৎপত্তিস্থল আটলান্টিক মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চল। এবং এদের উৎপত্তির মূলে আছে আয়নবায়ু। ফলে উত্তরে ও দক্ষিণে দুদিকে দুটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এরা উষ্ণ স্রোত। উত্তরদিকে প্রবাহিত স্রোতটিকে বলা হয় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণে প্রবাহিত স্রোতটির নাম দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। তবে এ দুটি স্রোত এককভাবে ছুটে যেতে পারছে না। পথে মিলিত হচ্ছে অন্যান্য কয়েকটি স্রোত।

ব্রেজিল স্রোত—দক্ষিণ মহাসাগরে উৎপন্ন বেঙ্গুয়েলা স্রোতটি আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করার পর দক্ষিণপূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে পশ্চিমে দিক পরিবর্তন করেছে এবং মিলিত হয়েছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে। সম্মিলিত স্রোতদ্বয় কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বাধা-

প্রাপ্ত হচ্ছে আমেরিকার সেন্ট রক অন্তরীপে। ফলে সম্মিলিত স্রোতটি পুনরায় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দুদিকে ছুটে চলেছে। একটি অগ্রসর হচ্ছে উত্তর দিকে এবং অপরটি দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণের স্রোতটি গিয়ে আবার প্রতিহত হচ্ছে ব্রেজিলে। প্রতিহত হওয়ার পর এটি মিশে যাচ্ছে কুমেরু স্রোতের সঙ্গে। স্রোতটি ব্রেজিলে প্রতিহত হচ্ছে বলেই নাম ব্রেজিল স্রোত।

উপসাগরীয় স্রোত—দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। উত্তর দিকের যে শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরপূর্ব উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে ক্যারাবিয়ান উপসাগরে প্রবেশ করেছে, সেই শাখাটির সঙ্গে ঐ উপসাগরেই মিলিত হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের দক্ষিণ শাখা। স্রোতদ্বয় মিলিত হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রবেশ করেছে মেক্সিকো উপসাগরে। অতঃপর ফ্লোরিডা প্রণালীর ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিলিত হয়েছে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর শাখার সঙ্গে। স্রোতটি বেশ মন্থর এবং যেহেতু মেক্সিকো উপসাগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তাই বলা হয় উপসাগরীয় স্রোত বা গালফ্ স্ট্রীম।

উপসাগরীয় স্রোতটি আবার ঐখানে থেমে যায়নি। আরও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার পর প্রবেশ করেছে আটলান্টিক মহাসাগরে। এখানে আবার ত্রিধাবিভক্ত হয়েছে স্রোতটি। প্রথম ও প্রধান শাখাটি উষ্ণস্রোত এবং এটি উত্তর আটলান্টিক স্রোত নামে পরিচিত। এই স্রোতটি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর পশ্চিম ইওরোপের উপকূল বরাবর সোজা চলে গেছে নরওয়ের দিকে।

দ্বিতীয়টি শীতল স্রোত এবং নাম ক্যানারী স্রোত। এটি প্রথমে দক্ষিণে ও পরে পশ্চিমে দিক পরিবর্তন করেছে। অবশেষে মিলিত হয়েছে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে। চলার পথে ক্যানারি স্রোত একটি বিস্তীর্ণ এলাকার চারপাশ ঘুরে প্রবাহিত হওয়ায় সৃষ্টি করেছে এক মস্তবড় আবর্ত। ঐ বিস্তীর্ণ এলাকাটি কিন্তু ভারি মজার! চারদিকে

প্রবাহিত হচ্ছে স্রোত, অথচ মাঝখানটাতে কিছু নেই—জল একেবারে স্থির। জল স্থির হওয়ায় এবং আবর্ত একেবারে না থাকায় সারা অঞ্চল জুড়ে কেবল আগাছা আর আগাছা। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০০ মাইল এই জায়গাটিকে অতিক্রম করতে সেদিন কলম্বসকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এখানে সার্গাসাম নামে একপ্রকার আগাছার জঙ্গল দেখে তিনিই এর প্রথম নামকরণ করেছিলেন "সার্গাসো সী।" বর্তমানে ঐ নামটি বহাল থাকলেও কেউ কেউ শৈবাল সাগরও বলে থাকেন।

তৃতীয় শাখাটি গ্রীণল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরদিকে চলে গেছে।

ল্যাব্রাডর স্রোত—ল্যাব্রাডর স্রোতের উৎপত্তিস্থল সুমেরু মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর। এটি প্রকৃতপক্ষে উত্তর মহাসাগর থেকে উৎপন্ন দুটি স্রোতের মিলিত রূপ। স্রোত দুটির একটি এসেছে গ্রীণল্যাণ্ডের পূর্বউপকূল বরাবর এবং অপরটি এসেছে ঐ গ্রীণল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূল দিয়ে। তারপর উভয়ে মিলিত হয়েছে ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের কাছে। তাই মিলিত এই স্রোত দুটির নাম ল্যাব্রাডর স্রোত। শীতলতম স্থান উত্তর মেরু থেকে আসায় স্রোতটি শীতল স্রোত।

ল্যাব্রাডর স্রোতটি এবার প্রবাহিত হতে হতে চলে এসেছে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের একেবারে কাছাকাছি অঞ্চলে। তারপর সেখান থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ধরে এগিয়ে গেছে সোজা দক্ষিণে। অবশেষে এমন এক জায়গায় এসেছে—যার পশ্চিম দিক দিয়ে বহে চলেছে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত।

উপরোক্ত দুটি স্রোতের মধ্যস্থল বেশ আশ্চর্যজনক! দুদিক থেকে বহে চলেছে দুটি স্রোত, অথচ কেউ কারও সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। একদিক থেকে ছুটে আসছে শীতলও গাঢ় সবুজ বর্ণের ল্যাব্রাডর স্রোত আর তার বিপরীতে ছুটে চলেছে উষ্ণ ও গাঢ় নীল বর্ণের জলস্রোত! বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুটি স্রোতের সীমারেখা। সীমারেখাকে বলা

হয় হিমপ্রাচীর। দূর থেকে উপভোগ করার মতই সে দৃশ্য। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের ঘোলা জল ও নীলজলের সীমারেখার চেয়েও অনেক—অনেক বেশী নয়নাভিরাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ হিমপ্রাচীরের কাছে যাওয়ার কোন উপায় নেই। বড় ভয়ঙ্কর ও বড় বিপজ্জনক সেই জায়গা। এমন প্রচণ্ড সেখানকার আবর্ত যে, জাহাজ ভিড়তে পারে না। আর আকাশে উড়োজাহাজ থেকেও দেখার বিপদ বড় ভয়ানক। উপরে বহুদূর পর্যন্ত প্রবল বায়ু-স্রোত ঘূর্ণিঝড়ের মত সবসময় প্রবাহিত হচ্ছে। চারপাশে কুজ্ঝটিকার যেন একটা পুরু পর্দা ওকে আরও ভয়ঙ্কর ও আরও আতঙ্ক করে রেখেছে। শুধু দূর থেকে দেখেই পরিতৃপ্ত হতে হয়। রহস্য ভেদ করার কোন উপায় নেই।

উক্ত অঞ্চলটি বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণ আছে। যে ল্যাব্রাডর স্রোতটি ছুটে আসছে এখানে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে প্রচুর হিমশৈল। সেগুলি যেন মেঘলার মত ঘিরে ফেলেছে স্থানটিকে। যেহেতু কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তাই জলটা অপেক্ষাকৃত গরমের জন্য হিমশৈলগুলি গলতে শুরু করেছে ঐ খানেই। আর হিমশৈল তো কেবল পাহাড়ের মত বিরাট বিরাট শুধু বরফের চাঁই নয়; তার সঙ্গে থাকে কাদা, পাথরকুচি প্রভৃতি বহু জিনিস। হিমশৈলের গলনের ফলে কাদা, পাথর প্রভৃতি মুক্ত হচ্ছে এবং সৃষ্টি করেছে মগ্ন চড়ার। তাই হিমবাহ, মগ্নচড়া ও প্রচণ্ড আবর্ত —এই তিনের একত্র সমাবেশ ঘটায় কোন জাহাজের পক্ষে নিরাপদে ফিরে আসা সম্ভব নয়। যে সব দুঃসাহিক গেছে, তারা কেউ ফিরে আসেনি।

অপরদিকে এখানকার উপরিস্থিত বায়ুস্তরও বিপজ্জনক হওয়ার কারণ আছে। শীতল ও উষ্ণ উভয় ধরণের সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় উপরের বায়ুপ্রবাহও দুধরণের। একদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহ এবং অপরদিক থেকে ছুটে আসছে শীতল ও শুষ্ক প্রবাহ। দুই প্রবাহের ধাক্কায় সবসময় লেগে আছে প্রচণ্ড ঝড়—

যা সাইক্লোনের চেয়েও ভয়াবহ। তদুপরি অধিকাংশ সময় গাঢ় কুজ্ঝটিকার আড়ালে মুখ ঢেকে আছে স্থানটি। পৃথিবীর উপরিভাগে এরচেয়ে ভয়ঙ্কর স্থান আর নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতসমূহ—ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজ চালাবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন, এর জল শান্ত ও স্থির। তাই মহাসাগরটির নাম রেখেছিলেন পেসিফিক ওসেন বা প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু ঠিক তা নয়। এখানেও ঝড় তুফান লেগে থাকে এবং অনেকগুলি স্রোতও প্রবাহিত। স্রোতগুলির মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের মতই কয়েকটি বিচিত্র স্রোত আছে। তবে আয়তনের তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোত আটলান্টিকের চেয়ে অনেক কম বলতে হবে।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাহিত স্রোতগুলির মধ্যে দুটি প্রধান স্রোত "জাপান স্রোত" এবং পেরু স্রোত। অপর অপ্রধান স্রোতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ব অস্ট্রেলিয় বা নিউসাউথ ওয়েলস স্রোত, কালিফোর্ণিয় স্রোত ও বেরিং স্রোত। অপরদিকে আয়নবায়ুর প্রভাবে এখানকার নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকেও উৎপন্ন হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাহিত পেরু স্রোত অনেকটা আটলান্টিক মহাসাগরের বেঙ্গুয়েলা স্রোতের মত। এর উৎপত্তিস্থল কুমেরু মহাসাগর বা দক্ষিণ মহাসাগর। স্রোতটি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল বরাবর প্রবাহিত হতে হতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রতিহত হয়ে আবার উত্তর দিকে বেঁকে গেছে। তারপর চিলি উপকূল হয়ে চলে গেছে একেবারে নিরক্ষ রেখার দিকে। সেইখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এই মিলিত স্রোতটি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে একেবারে অস্ট্রেলিয়ার, উপকূলে এসে গেছে। অতঃপর উপকূলভাগে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিভক্ত হয়েছে দুটি শাখায়। শাখাদুটির একটি পূর্ব অস্ট্রেলিয় স্রোত বা নিউ সাউথ ওয়েলস

স্রোত নামে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অপর শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে এগিয়ে গিয়ে পুনরায় পশ্চিমমুখী হয়ে প্রবেশ করেছে ভারত মহাসাগরে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং এশিয়ার পূর্ব উপকূলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হওয়ার পর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের তৃতীয় শাখার সঙ্গে মিলিত হয়ে জাপানের উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই এই স্রোতকে বলা হয়েছে "জাপান স্রোত"। একে কুরোশিয়ো স্রোতও বলা হয়।

কুরোশিয়ো স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবাহিত উপসাগরীয় স্রোতের মত উষ্ণ স্রোত। এটি মন্থরও বটে। এবং মন্থর হওয়ার ফলেই কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রধান শাখাটি পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে ক্রমাগত পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে চলে এসেছে একেবারে কানাডার উপকূলভাগে। সেখানে এটি আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। বিভক্ত হওয়ার পর একটি শাখা কালিফোর্ণিয়া স্রোত নামে প্রথমে দক্ষিণে ও পরে পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটি সেই আটলান্টিক মহাসাগরের উপসাগরীয় স্রোতের মত আবর্তও রচনা করেছে এবং রচনা করেছে সেখানকার মতই শৈবাল সাগর।

সুমেরু মহাসাগর থেকে উৎপন্ন একটি শীতল স্রোত বেরিং স্রোত নামে অগ্রসর হতে হতে মিলিত হয়েছে উষ্ণ জাপানস্রোতের একটি শাখার সঙ্গে। এখানেও উষ্ণ ও শীতল দুটি স্রোত মিলিত হওয়ায় সৃষ্টি করেছে সেই পূর্বের মত ভয়ঙ্কর হিম প্রাচীর। এখানেও সবসময় লেগে আছে ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা। সৃষ্টি হচ্ছে মগ্ন চড়া। অতি দুর্গম সেই স্থান। তবু আটলান্টিক মহাসাগরের মত এত ভয়াবহ নয়।

ভারত মহাসাগরের স্রোত—ভারত মহাসাগরে প্রবাহিত স্রোতের পরিমাণ অনেক কম। এর প্রধান কারণ, আটলান্টিক মহাসাগর কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের মত নিরক্ষরেক্ষার উত্তর ভাগে এমন বিস্তীর্ণ এলাকা

জুড়ে জলরাশি বিরাজ করছেনা। অপরদিকে উত্তর মহাসাগরের সঙ্গে কোন যোগাযোগও নেই। যোগ রয়েছে কেবলমাত্র দক্ষিণ মহাসাগরের সঙ্গে। ভারত মহাসাগরে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে আয়নবায়ুর প্রভাবে কেবলমাত্র দক্ষিণ নিরক্ষীয়স্রোত প্রবহমান। বাহিরের স্রোতগুলির মধ্যে একমাত্র পূর্ব অস্ট্রেলিয় স্রোতের একটি শাখা মহাসাগরে প্রবেশ করেছে।

কুমেরু মহাসাগরে উৎপন্ন শীতল স্রোতের একটি শাখা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তরাভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। তারপর দক্ষিণপূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে শাখাটি আবার পশ্চিমে বেঁকে সোজা মিলিত হয়েছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে। মিলিত স্রোতটি অতঃপর আরও পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি স্রোত মাদাগাস্কার স্রোত নামে মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণদিক ঘুরে এবং দ্বিতীয় শাখাটি মোজাম্বিক স্রোত নামে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে এগিয়ে গেছে। অবশেষে দুজনেই মিলিত হয়ে মিশে গেছে কুমেরু স্রোতের সঙ্গে।

ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে স্রোতগুলি একমাত্র মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে দুধরণের মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় এবং এদের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্রোতেরও উদ্ভব হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উৎপন্ন সোমালি স্রোত আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল দিয়ে এগিয়ে এসে আরব সাগর হয়ে প্রবেশ করেছে বঙ্গোপসাগরে। তারপর সেখান থেকে এগিয়ে গেছে একেবারে সুমাত্রার দিকে। মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে উৎপন্ন স্রোতগুলির মধ্যে এইটিই প্রধান স্রোত। তবে গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন স্রোত শীতকালে ঠিক একইভাবে প্রবাহিত হয় না। তখন উত্তর -পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিপরীত মুখেই প্রবাহিত হয়।

সমুদ্র স্রোতগুলির ক —সমুদ্র স্রোতগুলি প্রবাহিত হওয়ার জন্য আমাদের সুবিধা বড় কম হচ্ছেনা। আজকের দিনে আমরা সমুদ্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করে আছি। বিশেষ করে আমাদের জাহাজে করে দূরদূরান্তরে পাড়ি দিতে হচ্ছে এবং খাদ্যের একটা বিরাট চাহিদা পূরণ করছি সামুদ্রিক মাছের সাহায্যে। অথচ এই দুই প্রধান কাজে আমাদের সাহায্য করছে সামুদ্রিক স্রোতগুলি।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন উষ্ণস্রোতগুলি দূর দূরান্তরে-এমনকি মেরুর দিকেও এগিয়ে চলেছে। ঐ উষ্ণ স্রোতগুলির প্রভাবে হিম মণ্ডলে অবস্থিত স্থানসমূহে বরফগলার কাজ বেশ সহজ হচ্ছে। ফলে বহু উপকূলভাগ, সাগর, উপসাগর ইত্যাদি বরফমুক্ত হতে পারছে। আর ঐ বরফমুক্তির ফলে বিশেষ বিশেষ জায়গাসমূহে জাহাজ চলাচলের সুবিধা হচ্ছে অনেকখানি। তাছাড়া স্রোতগুলির অভিমুখে জাহাজদের চলতেও ভারি সুবিধা!

উষ্ণসাগর স্রোতগুলি প্রবাহিত হওয়ার ফলে স্থলভাগের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সুবিধা হচ্ছে। উষ্ণস্রোত যেদিকেই প্রবাহিত হয় সেইদিকের উপরিস্থিত বায়ু যথেষ্ট জলীয়বাষ্প লাভ করার সুযোগ পায়। তাই যখনই সেই বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় তখনই বহন করে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প। উক্ত কারণেই স্থলভাগের উপর ঘটে প্রচুর বৃষ্টিপাত।

সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগরদ্বয়ে উৎপন্ন শীতল স্রোতগুলি যখন কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির দিকে অগ্রসর হয় তখন সেই স্রোতগুলির সঙ্গে ভেসে আসে অগাধ মাছ। যেহেতু শীতল স্রোতগুলি আবার মিলিত হয়েছে নিরক্ষীয় উষ্ণস্রোতগুলির সঙ্গে, তাই ঐ মিলনস্থলে সূচিত হয়েছে মনোরম পরিবেশ। ফলে মাছগুলি কোথাও না গিয়ে থেকে যাচ্ছে ঐখানেই। কিছু কিছু মাছ আবার ডিম পাড়ার জন্য ছুটে আসে ঐ মিলন স্থানেই। উক্ত কারণে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সংযোগস্থলগুলিতে ধৃত হয় প্রচুর মাছ।

সমুদ্রস্রোতগুলি শুধু যে উপকার করছে তা নয়, কিছু কিছু

অপকারও করছে। উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সংযোগস্থলগুলিতে উষ্ণতার দারুণ তারতম্য ঘটার জন্য মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর সব ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং সেই ঘূর্ণিঝড় কখনও কখনও ছুটে এসে উপকূলভাগে আছড়ে পড়ে। ফলে উপকূলভাগ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বহু সম্পদ ও জীবনহানির কারণ হয়। অপরদিকে ওদের গতিপথে জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি পড়লেও জলমগ্ন হয়ে যায়। ল্যাব্রাডর উপকূলে হারিকেন, জাপানের উপকূলে টাইফুন এই জাতীয় ভয়ঙ্কর ঝড়।

## সাগরবক্ষে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ

বায়ুপ্রবাহের একমাত্র কারণ সৌরতাপ। দিবাভাগে সূর্য আকাশে থাকায় জলভাগ এবং স্থলভাগ দুইই উত্তপ্ত হয়। যদিও তুলনামূলক-ভাবে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগের উত্তাপ বেশী বৃদ্ধি পায়।

সূর্যতাপে জলভাগ এবং স্থলভাগ উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তাদের উপরিস্থিত বায়ুও উত্তপ্ত হয় এবং হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। অপরদিকে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ অধিক উত্তপ্ত হওয়ার দরুন এখানকার উপরিস্থিত বায়ুতে নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। তুলনায় সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ু কম উত্তপ্ত হওয়ায় স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ উচ্চ। আর ঠিক কারণেই দিবাভাগে উপকূলবর্তী অঞ্চলে যখনই নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তখনই অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত বায়ু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয়। উক্ত বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় সমুদ্র বায়ু। স্থলভাগের উত্তাপ যতই বাড়তে থাকে ততই এই বায়ু জোরে জোরে প্রবাহিত হয়। সাধারণত বিকেলের দিকেই উপকূলভাবে অনুরূপ বায়ুপ্রবাহকে অনুভব করা যায়।

আবার সূর্যাস্তের পরে স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করতে শুরু করে এবং রাত যত বাড়তে থাকে ততই-বিকিরণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে স্থলভাগ দ্রুত তাপ হারায় এবং উপরিস্থিত বায়ুও শীতল হয়। কিন্তু সাগরপৃষ্ঠ স্থলভাগের মত এত দ্রুত তাপ হারাতে পারে না। তাই তার উপরিভাগের বায়ু স্থলভাগ অপেক্ষা নিম্নচাপযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে। অথচ তাপ হারাতে হারাতে একসময় স্থলভাগের উপর সৃষ্টি হয় উচ্চচাপযুক্ত বায়ু। আর তখনই স্থলভাগ থেকে বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। একে বলা হয় স্থলবায়ু এবং ওকে অনুভব করা যায় ভোরের দিকে।

মৌসুমী বায়ু, ঘূর্ণিঝড় প্রবাহ—আরবী মৌসিম কথাটির অর্থ ঋতু। উক্ত কারণে ঋতুভেদে যে বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হয় মৌসুমী বায়ু।

সাধারণত সূর্য যখন যে অঞ্চলের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সেই অঞ্চলের উপরিস্থিত বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। অনুরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চল থেকে বায়ু ছুটে এসে স্থানটি দখল করতে চায়। মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তির মূল কারণ প্রধানত এই।

দুরকমের মৌসুমীবায়ুকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। গ্রীষ্ম মৌসুমী ও শীত মৌসুমী। গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণের জন্য সূর্য নিরক্ষরেখা থেকে কিছুটা উত্তরে সরে গিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখার সমীপবর্তী হয়। যেহেতু কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ অধিক। সূর্য এই অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চলের স্থলভাগ যথা—মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর পশ্চিম ভারত, আফ্রিকার গিনি উপকূল প্রভৃতি বেশ গরম হয়ে উঠে। ফলে এইসব স্থানেই তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং উপরিস্থিত বায়ু ও উত্তপ্ত হওয়ায় নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। অথচ নিকটবর্তী জলভাগ তথা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিস্থিত বায়ু ততখানি উত্তপ্ত হতে না পারায় উচ্চচাপযুক্ত অবস্থায় থেকে যায়। গ্রীষ্মের ঐ উচ্চ-চাপযুক্ত সমুদ্রের উপরিভাগের বায়ু নিম্নচাপযুক্ত স্থলভাগের দিকে আপনিই ছুটে আসে, যেহেতু সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই নিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প। ফলে প্রবাহিত হলেই স্থলভাগের উপর ভালভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়। আর মাঝে মাঝে এই বায়ু-প্রবাহ এত তীব্র হয়ে উঠে যে, আয়ন বায়ুর প্রবাহকেও বন্ধ করে দেয়। গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত এই বায়ু প্রবাহকে বলা হয় গ্রীষ্ম মৌসুমী। এটি যেহেতু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসে-তাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুও বলা হয়। এর প্রভাবে ভারত, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ্রীষ্ম মৌসুমীর প্রবাহ কতকগুলি শাখায়ও বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শাখা আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতের পশ্চিম্ উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। দ্বিতীয় আর একটি শাখা আসে বঙ্গোপসাগর দিয়ে এবং এর প্রভাবে পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি হয়।

গ্রীষ্মকালে আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহকে বেশ ধরা যায়। ভ্যাপসা গরম ও পরে দক্ষিণ-পশ্চিমের জোরালো বাতাস বহিতে শুরু করে। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। দু' চারদিন যদি এইভাবে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার পর মেঘ জমে তাহলে খুব ভারী ধরণের বর্ষা হয়। গ্রীষ্মমৌসুমী কখনও কখনও চৈত্র মাসেও আসতে দেখা গেছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আষাঢ় মাসের দিকে আসে এবং বিদায় গ্রহণ করে ভাদ্রের দিকে।

শীত মৌসুমী প্রবাহিত হয় শীতকালে। এইসময় সূর্যের দক্ষিণায়ন চলতে থাকে। সূর্য তখন নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে সরে গিয়ে মকরক্রান্তি অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। তবে মকরক্রান্তি অঞ্চলে কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চল অপেক্ষা স্থলভাগ অনেক কম। অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণাংশ প্রভৃতি এই সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠার জন্য উপরিস্থিত বায়ুতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে উত্তর গোলার্ধে-সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ার জন্য সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হতে না পারায় উচ্চ চাপযুক্ত থাকে। বায়ু চাপের ঐ বৈষম্যের ফলে উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে বায়ু মকরক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। যেহেতু উক্ত বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়, তাই বলা হয় উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ু।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু আবার প্রবাহিত হয় স্থলভাগের উপর দিয়ে। তাই ওর সঙ্গে জলীয় বাষ্প থাকে না বললেও হয়। আর ঐ

কারণে বৃষ্টিপাতও হয় না। কেবল একটি শাখা—যেটি জাপান সমুদ্রকে অতিক্রম করে আসে, তাতেই থাকে কিছুটা জলীয় বাষ্প। এর প্রভাবে ভারতবর্ষের তামিলনাড়ু অঞ্চলে এবং শ্রীলঙ্কায় শীতকালে বৃষ্টি হয়।

পশ্চিমবাংলার মানুষ বিশেষ দুটি ঝড়ের সঙ্গে বেশ পরিচিত। সে দুটি ঝড়ের একটি বৈশাখের ঝড় বা কালবৈশাখী এবং আশ্বিনের ঝড়। দুটি ঝড়েরই কারণ, এক মৌসুমীর আগমন আর অপর মৌসুমীর প্রত্যাবর্তন। এক কথায় আগমন ও নির্গমন—এই দুয়ের সংঘাত বা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ফল। চৈত্র-বৈশাখে উত্তরপূর্ব মৌসুমীবায়ুর বিদায় ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর আগমন সূচিত হয়। অপরদিকে ভাদ্র আশ্বিন মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর বিদায় গ্রহণ করে এবং আগমন হয় উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ুর। তারই প্রতিক্রিয়া ঝড় ও বৃষ্টি মাঝে মাঝে সেই প্রতিক্রিয়া এত প্রবল হয়ে যে সমুদ্রবক্ষে ডিপ্রেসান তথা নিম্নচাপেরও সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন শুরু হয় ঘূর্ণিঝড়। বাংলায় এই ঘূর্ণিঝড় তথা সাইক্লোনের সঙ্গে কেনা পরিচিত? বিশেষ করে ভাদ্র আশ্বিনে যেন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর বিদায় গ্রহণ উপলক্ষ্যেই বেশী দেখা যায়। বিদায়ের সময় সে যেন একটা দাগ রেখে যেতে চায় অথবা মরণ কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে যেতে চায়।

অনেকের মতে আবার উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি নাকি আদৌ হয়না। যতটুকু হয়—তা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর বিদায় প্রাক্কালেও অন্যান্য কতকগুলি কারণে।

স্থলভাগে বায়ুপ্রবাহের একমাত্র কারণ সমুদ্র। বায়ুপ্রবাহের ফলে আমাদের সুবিধা বড় কম হচ্ছে না। বিশেষতঃ স্থলভাগের রোগ-জীবাণুদের এই বায়ুপ্রবাহই প্রতিহত করছে। বায়ুপ্রবাহ না থাকলে স্থলভাগ রোগ জীবাণুতে ভরে যেতো, মহামারীতে উজাড় হয়ে যেতো, বছরের অধিকাংশ সময় মানুষকে রোগশয্যায় শায়িত থাকতে হতো।

অপরদিকে শ্যামলা এই পৃথিবীর বুকটাও অপরূপা হয়ে আছে সাগর বায়ুর ফলেই। শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত সমুদ্রবায়ু সঙ্গে প্রচুর জলীয় বাষ্পকে নিয়ে ছুটে আসে স্থলভাগে। যে ঋতুতে যে স্থলভাগের

উপর সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয় সেই ঋতুতে সেই স্থলভাগের উপর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাইতো পৃথিবীর এমন মনোহর রূপ, তার বক্ষের জীবও উদ্ভিদজগৎ, তার নদী-নির্ঝর ইত্যাদি। সাগর যদি না থাকতো, সাগরবায়ু যদি প্রবাহিত না হতো তাহলে অপরাপর গ্রহের মত পৃথিবীও একটা মরা জগতে পরিণত হতো।

সমুদ্রবায়ু কিছু কিছু ক্ষতিও করে। অমৃত ও গরল, তথা ভাল ও মন্দ নিয়ে যখন জগৎ তখন এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। সমুদ্রবায়ু যেমন পৃথিবীকে আনন্দের পসরা উপহার দিয়ে কোলাহল মুখর করেছে তেমনই কখনও কখনও ঝড়ের রূপ নিয়ে উপকূলভাগকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করে ছাড়ে।

সাধারণত দেখা গেছে, ক্রান্তীয় অঞ্চলে সমুদ্রবক্ষে কতকগুলি ঝড় কেন্দ্রীভূত হয়। সেই ঝড়গুলিকেই আমরা ঘূর্ণিঝড় বলি। বায়ুচাপের তারতম্য যদি খুব বেশী হয় তাহলেই সাগরবক্ষে কেন্দ্রীভূত হয় নিম্নচাপ বা ডিপ্রেসন।

ডিপ্রেসনের জন্য প্রথমে সৃষ্টি হতে হয় একটি কেন্দ্রের। ঐ কেন্দ্রটি আবার সৃষ্টি হয় কোন স্থানের বায়ু হঠাৎ উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে শূন্যতার সৃষ্টি করলে। তখন চাপের সমতা রক্ষার জন্য চারদিকের উচ্চচাপযুক্ত বায়ু কেন্দ্রের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হয়। কিন্তু সেগুলিও কেন্দ্রে প্রবেশ করার পর উষ্ণ হয়ে উঠে এবং এরাও হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে পূর্বের মতই নিম্নচাপ কেন্দ্র থেকে যায় এবং পুনরায় ছুটে আসে উচ্চচাপযুক্ত বায়ু। এইভাবে পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও উর্ধ্বগামী হয়ে থাকে। আর চারদিকের শীতল ও ভারি বায়ু তখন প্রবলগতিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে কেন্দ্র থেকে ঘুরতে ঘুরতে উর্ধ্বে উঠতে থাকে এবং সেই দিক থেকে বায়ু প্রবলবেগে ছুটে আসছে সেই দিকেই দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কখনও কখনও এই বাতাসের ছুটে চলার বেগ ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশী হয়ে থাকে।

ঘূর্ণিঝড় বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার কোন স্থানকে অবলম্বন করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটতে থাকে। কেন্দ্রে থেকে যায় সর্বনিম্ন চাপ এবং কেন্দ্র

থেকে ক্রমশ দূরের দিকে অবস্থান করে উচ্চচাপের বায়ু। সমুদ্রে এই জাতীয় ঝড় যখন কেন্দ্রীভূত হয় তখন রেডার যন্ত্র এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ধরা পড়ে। আর ঐ কারণেই ঝড়ের পূর্বাভাষ প্রদান সম্ভব হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপকুল ভাগের মানুষের সঙ্গে যে ঘূর্ণিঝড়ের পরিচয় আছে—সেটির নাম সাইক্লোন। এটিকে বৃষ্টিকালে এবং শীতকালে বেশ কয়েকবারই কেন্দ্রীভূত হতে দেখা গেছে। এর প্রচণ্ডতা বৃষ্টিকালে বাংলা ও উড়িষ্যার উপকূলে আর শীতকালে অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপকূলে অধিক। এর প্রভাবে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ঘটে এবং উপকূলভাগকে যেন দলিত ও মথিত করে দিয়ে যায়। তবে আরব সাগরেও কেন্দ্রীভূত হয় এই সাইক্লোন। ওর দাপটে ভারতের পশ্চিম উপকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সাইক্লোন অপেক্ষাও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রীভূত হয় ক্যারাবিয়ান সাগরে ও চীনসাগরে। ক্যারাবিয়ান সাগরে কেন্দ্রীভূত ঝড়টির নাম হারিকেন এবং চীনসাগরে যেটি কেন্দ্রীভূত হয় তার নাম টাইফুন। এই ঝড়গুলির গতিবেগ ঘন্টায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশী। হারিকেনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাংশ। টাইফুন ক্ষতি করে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-চীন ও জাপানের উপকুলভাগকে। যেন এরা সহস্র সহস্র মত্ত দৈত্যের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্ত মধ্যেই সবকিছুকে তছনছ করে দেয়।

এছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরেও ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায়। আর সব ঘূর্ণিঝড়ই সর্বনাশা ও ভয়ঙ্কর।

# জোয়ার-ভাটা

যারা সমুদ্র দেখতে অভ্যস্ত তারা জানে সারা দিনে ও রাতে মোট দুবার ধীরে ধীরে সাগরের জল ফেঁপে উঠে। সেই সময় নিকটস্থ নদী কিংবা খালে জল প্রবলবেগে ঢুকতে থাকে। জলস্ফীতি প্রায় ছ-ঘণ্টা ধরে চলে, তারপর থমথমে হয়ে গিয়ে জল পুনরায় নামতে শুরু করে। এই নামার কাজও চলে প্রায় ছ-ঘণ্টা। এক জলস্ফীতি থেকে প্রায় বার ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় জল ফাঁপতে আরম্ভ করে। সাগরের এই জলস্ফীতিই জোয়ার এবং জল নেমে যাওয়াকে বলে ভাটা।

জোয়ার-ভাটার মূল কারণ পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ। সূর্য আয়তনে বিরাট হলেও সে অবস্থান করছে পৃথিবী থেকে ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে। আর চন্দ্র ছোট হলে কি হবে সে আছে পৃথিবী থেকে মাত্র ২৩৯০০০ মাইল দূরে। তাই সূর্য অপেক্ষা পৃথিবী-পৃষ্ঠে চন্দ্রের আকর্ষণ বলই প্রবল। প্রধানত ঐ চন্দ্রের আকর্ষণ বলই জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর হয়ে থাকে।

যেহেতু কঠিন পদার্থের মত তরলের অণুগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। অণুগুলির মধ্যে ফাঁক যথেষ্ট থাকে। তাই ওর নির্দিষ্ট কোন আকার নেই এবং একটা গড়ানে ধর্ম রয়েছে। অপরদিকে পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে আর চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। ঐ তিনের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বিদ্যমান। আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন চন্দ্র ভূপৃষ্ঠের জলভাগের সম্মুখবর্তী হয় তখন তার আকর্ষণের জন্য জল সেইদিকেই ফুলে উঠে। পৃথিবী গোলাকার এবং তার ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইলের মত। তাই চন্দ্র পৃথিবীর যে-পাশে অবস্থান করে সেখানে চন্দ্রের যে আকর্ষণ বল কাজ করে তার বিপরীত পাশে সমুদ্র জলে কিন্তু ততটা আকর্ষণ কাজ করে

না। তাছাড়া যেদিকে চন্দ্র থাকে সে-পাশে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে আকর্ষণ, ৪০০০ মাইল ব্যবধানে ভূকেন্দ্রে আকর্ষণ তার চেয়ে কম। ফলে গড়ানে ধর্ম বিদ্যমান থাকায় জল যতটা সরে যায় ভূকেন্দ্র ততটা সরতে পারে না।

ভূকেন্দ্র থেকে বিপরীত পৃষ্ঠ আরও ৪০০০ মাইল দূরে। সাগর-তলার ভূভাগ আবার ভূকেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। সামনে চন্দ্রের দিকে ভূভাগের জল যতখানি সরে আসে বিপরীত দিকে ভূভাগের জল ততখানি সরে আসতে পারে না। যেন পিছিয়ে পড়ে অনেকখানি। তাই সেখানকার জলও স্ফীত হয়ে থাকে।

অতএব একই সময়ে চন্দ্রের সম্মুখস্থ জলভাগে এবং বিপরীত পৃষ্ঠের জলভাগে জোয়ার হয়। সামনের দিকে জোয়ারকে বলা হয় মুখ্য জোয়ার ( প্রাইমারী টাইড ) এবং বিপরীত দিকের জোয়ারকে বলা হয় গৌণ জোয়ার ( সেকেণ্ডারী টাইড )। পৃথিবী যেহেতু স্থির হয়ে নেই। তাকে অবিরত পাক খেতে হচ্ছে। ফলে চন্দ্রের সামনের দিকটাও ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন ভূভাগ চন্দ্রের সামনে আসছে। তাই জোয়ার-ভাটারও স্থানের পরিবর্তন হচ্ছে।

পৃথিবীর একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা সময়। খুঁটিনাটি সময়ের হিসেবটা উপেক্ষা করলে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, চন্দ্র যখন যেখানে থাকে তার বার ঘণ্টা পরে বিপরীত দিকে এসে যায়। তখন বার ঘণ্টা পরে বিপরীতে হয় মুখ্য জোয়ার। অতএব এক ভাটা থেকে এক জোয়ার ছ-ঘণ্টা সময়।

অন্যদিকে সূর্যের আকর্ষণ বলও পৃথিবীর উপর কাজ করছে। কিন্তু অনেক দূরবর্তী বলে পৃথিবীর জলরাশির উপর তার আকর্ষণ সবসময় ভালভাবে ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে। এই দুই তিথিতে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী থাকে একই সরল-রেখায়। অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করে সূর্য ও চন্দ্র এবং পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র একই সরলরেখায় পৃথিবীর দুদিকেই থাকে। তাই এই দুই তিথিকে একই দিকে দুজনের আকর্ষণ

সম্মিলিতভাবে কাজ করায় জলের স্ফীতি বেশী হয় এবং তাই বলা হয় ভরা কটাল বা তেজ কটাল ( স্প্রিং টাইড )।

সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে কিন্তু উল্টোটাই ঘটে। অর্থাৎ উক্ত সময়ে সূর্য ও চন্দ্র অবস্থান করে পৃথিবী থেকে সমকোণে। চন্দ্রের আকর্ষণ বেশী হওয়ায় চন্দ্রের সম্মুখস্থ ভূভাগে জোয়ার হয় আর সূর্যের সম্মুখস্থ ভূভাগে হয় ভাটা। এই জোয়ারে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার মত জল ততখানি স্ফীত হয় না। একে বলা হয় মরা কটাল ( নিপ টাইড )।

পৃথিবী যেহেতু চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তন শেষ করে, তাই আজ যে সময় যেখানে জোয়ার আগামীকাল সেই সময় ঠিক সেইখানেই জোয়ার হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। কারণ, চন্দ্রও স্থির নয়। তাকেও পৃথিবীর চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমা করতে হচ্ছে। সে প্রায় ২৮ দিনে একবার পরিভ্রমণ করছে পৃথিবীর চারদিকে। তাই প্রতিদিন চন্দ্রের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটছে একটু একটু করে। অতএব প্রতিদিন একই সময় একই জায়গায় জোয়ার আসে না। দেখা গেছে পরের দিন জোয়ার আসতে প্রায় ৫২ মিনিট সময় বেশী লেগে যায়। অর্থাৎ এক মুখ্য জোয়ার থেকে আর এক মুখ্য জোয়ারের অথবা এক গৌণ জোয়ার থেকে আর এক গৌণ জোয়ারের ব্যবধান ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট। আবার যেহেতু পৃথিবী পশ্চিমদিক থেকে পূর্ব-দিকে পাক খাচ্ছে, তাই জোয়ারে জলের স্রোত বিপরীতে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়।

দেখা গেছে, পূর্ণ জোয়ারের সময় জলের স্ফীতি ঘটে তিন থেকে চার ফুটের মত। তবে অপ্রশস্ত নদীমুখ, অগভীর মহীসোপান, অথবা পলিতে ভর্তি নদীর মোহানা দিয়ে অনেক সময় বেশ উঁচু হয়েই জল প্রবেশ করে। একে বান বলে এবং গঙ্গার বানের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। শুধু গঙ্গা নয়, বহু নদীতে এমনকি ইয়াং সিকিয়াং-এর মত নদীতেও বান পড়ে।

জোয়ার-ভাটা কিছু কিছু উপকার করে থাকে। জোয়ারের সময় নদীমুখে জাহাজ, নৌকা ইত্যাদির প্রবেশ করতে সুবিধা হয়; ভাটার

টানে পলি অপসারিত হয় ও নানা আবর্জনা অপসারিত হওয়ায় নদীর মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। জোয়ারে মাছও আসে এবং নদীতে মৎস্য শিকারের সুবিধা হয়।

আজকাল বিজ্ঞানীরা জোয়ার-ভাটার একটা অসুবিধার কথাও বলছেন। তাঁদের মতে জোয়ার-ভাটার ফলে সাগরতলায় জলের ঘর্ষণের জন্য পৃথিবীর আবর্তনকোটা ধীরে ধীরে কমছে। যদিও নিতান্ত অল্প অর্থাৎ প্রায় একশ বছরে মাত্র ১১ সেকেণ্ডের মত সময়ের ব্যবধান হচ্ছে।

## সাগর তরঙ্গ এবং তার প্রভাব

সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দূর মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, যত ঢেউ, সে কেবল তীরের কাছেই আছাড় খেয়ে পড়ছে। যেন ধ্যানমগ্ন মহাযোগী মহাদেবের পদতলে মাথা খুঁড়ে মরছে। দূরের দিকে ঢেউ দেখা যায় না। তবে দূরের জল স্থির বা নিশ্চল যে নয়, তা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। মনে হয় সর্বত্রই একটা আন্দোলন চলছে, ছোট ছোট ঢেউ উঠছে পড়ছে, গাঙচিলরা একেবারে যেন জলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে কিন্তু ঢেউ তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। দূর সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হাঁসের দল, নৌকা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় ওরা যেন কেবল দোলায় দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু উন্মত্ত ঢেউ তাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে না।

দূর সমুদ্রে সত্যই ঢেউএর চূড়া দেখা যায় না। তবে সর্বত্রই একটা আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে ঢেউ সেখানেও উঠে। অর্থাৎ সাগরের ঢেউ সৃষ্টি হয় বাতাসের দ্বারা। বাতাসের গতিবেগ যত বাড়ে এবং যতই দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় ততই ঢেউএর উচ্চতা বাড়ে। আবার দূর থেকে তরঙ্গগুলি ছুটে এসে যখন উপকূলের কাছে অগভীর জলে পেঁ াছায় তখন তরঙ্গের চূড়া বেশ উঁচু হয়ে উঠে এবং পরিশেষে উপকূলের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে। যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে এবং আকাশে মেঘ জমে, তখন একেবারে যেন অশান্ত হয়ে উঠে সাগরবক্ষ। যেন ঢেউগুলো ছোটখাট এক-একটা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে বেলাভূমিকে গ্রাস করতে ছুটে আসে। অবশেষে আছাড় খাওয়ার পর যে জলটা ছুটে এসেছিল সে আবার ফিরে যায় সাগরগর্ভে।

অন্যান্য কারণেও ঢেউর উৎপত্তি হয়ে থাকে। সাগরতলায় যদি কোথাও ভূমিকম্প হয় তাহলে ঢেউ-র সৃষ্টি হয় প্রচণ্ডভাবে। প্রশান্ত

মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলভাগে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়ে থাকে। তাই সেখানে এমন ভয়ঙ্কর সব ঢেউ-র উৎপত্তি হয় যে, উপকূলভাগটাকে মাঝে মাঝে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়ে যায়। বড় বিপজ্জনক এইসব ঢেউ, শীর্ষদেশ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ছুটে আসে। জাপানীরা এই ভয়ঙ্কর ঢেউ-র নাম রেখেছে "ৎসুনামি"।

সাগরে নিম্নচাপ কেন্দ্রীভূত হলে প্রবলবেগে ঝড়ো হাওয়া বহিতে শুরু করে এবং এরই প্রভাবে ঢেউ বেশ উঁচু হয়ে উঠে। কখনও কখনও সাগরের বুকে জলস্তম্ভেরও সৃষ্টি হয়। যেন বিশাল এক পর্বত হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সাগরবক্ষে। চলমান সেই জলের পর্বত কখনও সেই সাগরে বিলীন হয়ে যায় আবার কখনও ছুটে এসে উপকূলের উপর ভেঙ্গে পড়ে। তার ফলে বিরাট অংশ সমুদ্রজলের দ্বারা প্লাবিত হয়। তখন মৃতের সংখ্যা গণনা করা যায় না।

সাগর তরঙ্গ দু-ধরণের। ঝটিকা তরঙ্গ ও গঠনকারী তরঙ্গ। ঝটিকা তরঙ্গকে আবার বিনাশকারী তরঙ্গও বলা হয়। উক্ত তরঙ্গের দ্বারাই উপকূলভাগ ক্ষতবিক্ষত হয়। কিন্তু গঠনকারী তরঙ্গ উপকারই করে থাকে। এই তরঙ্গ সাধারণ শান্ত তরঙ্গ। বহে নিয়ে আসে ছোট ছোট পাথরের টুকরো, শামুক ইত্যাদিকে। সেগুলি বেলাভূমিতে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হয় এবং বেলাভূমিকে প্রসারিত করে।

কথায় বলে "সাগরের এ-কূল ভাঙ্গে ও-কূল গড়ে"। ঐ ভাঙ্গা গড়ার কাজটি সম্পন্ন করে সাগর তরঙ্গ। আছড়ে পড়া বড় বড় ঢেউএর এমন ক্ষমতা যে, ওরা কঠিন শিলাস্তরেও ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে। একবার কোনরকমে একটুখানি ফাটল ধরলেই হল। আঘাতের পর আঘাত হানতে হানতে তাকে একেবারে চুরমার করে ছাড়ে। ফলে উপকূলভাগ একেবারে খাড়া হয়ে যায়, কোথাও খাঁজ সৃষ্টি করে, আবার কোথাও কোথাও সৃষ্টি করে বড় বড় গহ্বর। তবে শিলাস্তরের মাঝে কোন দুর্বল অংশ, থাকলেই তরঙ্গের আঘাতে দুর্বল অংশটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং তখনই গহ্বরের উৎপত্তি হয়। অপর-দিকে শিলাস্তরটাও খাড়া হয়ে উঠে।

ঐ ক্ষয়ের ফলে উপকূলভাগের চেহারা সর্বত্র সমান নয়। কোথাও উপকূলভাগ সাগরের দিকে ঝুলে পড়েছে আবার কোথাও বিস্তীর্ণ সৈকত। কোথাও উপকূলভাগ খাঁজকাটা, আবার কোথাও ভগ্ন।

ভগ্ন ও খাঁজকাটা উপকূল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠেছে মনে হয়। এইসব উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরতা যথেষ্ট হয়ে থাকে। তাই ভগ্ন উপকূলসমূহের একেবারে কাছে জাহাজের ভিড়তে কোন অসুবিধা হয় না। উক্ত কারণে যত বন্দর ও যত পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে সবই ভগ্ন উপকূলে। কিন্তু বিপজ্জনক বলে ভগ্ন উপকূলে স্থায়ী লোকবসতি কম।

আর এক ধরনের উপকূলভাগকে বলা হয় সরল উপকূল। উক্ত উপকূলভাগ বেশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাগরের দিকে। গঠনকারী তরঙ্গেরই আধিক্য এখানে। ওদের দ্বারা সঞ্চিত হচ্ছে বালি, পাথর প্রভৃতি। ফলে উপকূলভাগ ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। ভয় এখানে কম, উর্বর মৃত্তিকা এবং সুবৃষ্টির জন্য লোকবসতি বেশ ঘন।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, উপকূলভাগ যেমন ধরনের হোক না কেন, তার গঠনের ক্ষেত্রে একমাত্র সাগর তরঙ্গই দায়ী। সাগর তরঙ্গ একদিকে যেমন উপকূলের ক্ষতিসাধন করে অপরদিকে তেমনই নুড়ি, কাদা, পলি ইত্যাদিকে বহন করে। কিন্তু সাগর তরঙ্গ নুড়ি, পলি ইত্যাদিকে পায় কোথা থেকে ?

দূর দূর অঞ্চল থেকে যে-সব সমুদ্রস্রোত ছুটে আসছে, তারাই নিয়ে আসছে পাথরের টুকরো প্রভৃতিকে। সেগুলো সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকতে পারছে না। সাগর তরঙ্গই মাঝখান থেকে বহন করে নিয়ে আসছে বেলাভূমিতে। যে উপকূলভাগ ক্ষয় হচ্ছে সেখান থেকেও নিয়ে আসছে শিলাখণ্ড, মাটি প্রভৃতিকে। বহন করছে আগ্নেয়গিরির লাভা, মৃত শামুকের দেহ ইত্যাদি। তাই সাগর তরঙ্গ এক কূলকে ভাঙ্গে এবং অন্য কূলকে গঠন করে।

সাগর তরঙ্গ আরও অনেক উপকার করে। ওদেরই প্রভাবে

সমুদ্রবক্ষে মগ্ন চড়া, দ্বীপ প্রভৃতি জেগে উঠে। প্রবাল কীটের দেহাবশেষ, মাটি-পাথর ইত্যাদিকে জমা করতে থাকায় একদিন সাগরবক্ষে জেগে উঠে প্রবাল দ্বীপ। তার উপর ঢেউএর ঝাপটায় উপরিস্থিত বায়ুর অক্সিজেন সাগরজলে মিশবার সুযোগ পাচ্ছে। সেই অক্সিজেনই সাগরজলে দ্রবীভূত হয় এবং কিছু কিছু নেমে যায় তলদেশে। উক্ত কারণে সাগরের জীব ও উদ্ভিদরা অক্সিজেন লাভ করে বেঁচে থাকে। অপরদিকে কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইডও দ্রবীভূত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করছে খোলসযুক্ত প্রাণীরা।

## সাগরের তলদেশ

মহাসাগরের তলদেশের রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করা আজও সম্ভব হয়নি। ডুবুরীরা—যাঁরা সাগরের তলায় নামেন তাঁরা সাধারণত ১০০ ফুট থেকে ১৫০ ফুটের মধ্যে যাত্রা সীমাবদ্ধ রাখেন। ১৫০ ফুটের বেশী গভীরে যেতে হলেই দরকার হয় বিশেষ ধরনের পোষাকের এবং বিশেষভাবে তৈরি একটি প্রকোষ্ঠের। কেননা, যতই তলার দিকে নামা যায় ততই ভয়ঙ্কর জলের চাপের সম্মুখীন হতে হয়। সে-চাপ সহ্য করা মানবদেহের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই সাগর তলায় গিয়ে হাঁটা হাঁটি করা যায় না। কোন এক জায়গায় নেমে সেখান থেকে তথ্য ও ফটো সংগ্রহ করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গকে পাঠিয়েও সংগ্রহ করা হয় নানা তথ্য।

তবু যতটুকু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাও বড় কম নয়। জানা গেছে, ডাঙায় যেমন আছে সমভূমি, মালভূমি, পাহাড় পর্বত, আগ্নেয়গিরি, হ্রদ নামে পরিচিত গভীর খাত, তেমনই সবকিছু আছে মহাসমুদ্রের তলদেশে। তবে এগুলির প্রায় সবই অবস্থান করছে উপকূলভাগের কাছাকাছি অঞ্চলে। মাঝখানের দিকে পাহাড়-পর্বত, উচ্চভূমি, গভীর খাত ইত্যাদি খুবই কম। বা যা আছে তাকে মহাসাগরের বিরাট ব্যাপ্তির কাছে নগণ্যই বলা যায়। মাঝখানে তলদেশ একেবারে সমতলই বলতে হবে। সাগরতলের বৈচিত্র্য যেন ঐ উপকূলভাগকেই অবলম্বন করে।

প্রতিটি মহাসাগরের বুকে আছে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ। গবেষকদের অনুমান, এগুলির অধিকাংশই মহাদেশের বিচ্ছিন্ন অংশ। বাদবাকি সমুদ্রে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের দেহাবশেষ স্তূপীকৃত হয়ে গঠিত প্রবাল দ্বীপ এবং আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত থেকে উৎপন্ন আগ্নেয় দ্বীপ।

মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন জলভাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে নানা সাগর ও উপসাগর। অধিকাংশ সাগর ও উপসাগরের এমন বহুস্থান আছে যেখানকার গভীরতা মহাসাগরের মতই।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বীর ডুবুরীরা গভীর সমুদ্রের তলদেশে অবতরণ করেছেন এবং তথাকার মাটিও এনেছেন। সেইসব মাটি পরীক্ষা করে জানা গেছে, উপকূলভাগের কাছাকাছি মাটির সঙ্গে তলদেশের মাটির কোন সাদৃশ্য নেই।

অথচ আমরা জানি, সেই আদিকাল থেকে বৃষ্টির জল ডাঙার ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি ও মাটির কিছু কিছু উপাদানকে নিয়ে গড়িয়ে যায় নদীতে। নদী আবার সেগুলিকে জমা করে সাগরে। এইভাবে নদীকর্তৃক বাহিত পলি জমা হচ্ছে সাগরের তলদেশে। কিন্তু অতি দূরে বাহিত হচ্ছে না বা সাগরের মাঝখানে পলি জমতে পারছে না। এদের দ্বারা নদীর মোহানার কাছে চর গড়ে উঠছে এবং কোথাও উপকূলভাগ প্রসারিত হচ্ছে।

পরীক্ষা করে জানা গেছে, উপকূল থেকে প্রায় তিনশ' মাইল পর্যন্ত পলি জমতে পারে। তবে সে-সব পলি অক্ষত নেই। বছরের পর বছর পলি জমা হচ্ছে আর আভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপের প্রভাবে নিম্নাংশ নানারকম শিলায় পরিণত হচ্ছে। তবে সঞ্চিত এইসব পলিতে সামুদ্রিক জীবজন্তুর হাড়, শামুক ও ঝিনুকের খোলস অথবা জীবজন্তুর দেহাংশ মিশে যাচ্ছে। কালক্রমে পলির সঙ্গে এগুলি ও শিলাতে পরিণত হচ্ছে। কোথাও শুধু ছাপ থেকে যাচ্ছে। এগুলি দেখেই পণ্ডিতেরা অতীতের লুপ্ত প্রাণীর পরিচয় উদ্ধার করে থাকেন। অপরদিকে সাগরতলায় ডাঙা থেকে তিনশ মাইল দূরত্বের মধ্যে শিলা ও পলির সঙ্গে ডাঙার মাটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

তিনশ' মাইল থেকে আরও দূরের মাটি পরীক্ষা করে জানা গেছে, সেগুলির সঙ্গে ডাঙার মাটির কোন সাদৃশ্যই নেই। তলায় অবশ্য কাদা আছে। তবে সে-কাদা নরমও নয় কিংবা পলিমাটির দ্বারাও উৎপন্ন হয়নি। পলিমাটি এবং কাদা সাধারণত ধূসর কিংবা কালো

হয়ে থাকে। কিন্তু, দূর সমুদ্রের তলদেশের কাদা অনেকটা লাল রঙের ; আবার একে ঠিক কাদাও বলা চলে না। শক্ত এক আস্তরণ যেন এবং তার উপরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোটবড় নুড়ি। বিজ্ঞানীরা ঐ নুড়ির নাম দিয়েছেন ম্যাগনেসিয়াম নডিউল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ায় কালক্রমে উৎপন্ন হয়েছে এই নুড়ির। বিজ্ঞানীরা ওদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন, কাদাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত থেকে। অর্থাৎ আদিম পৃথিবীর আদিম মৃত্তিকা ও শিলা অনেকটা অক্ষত থেকে গেছে সাগরতলায়। তাই আদিম পৃথিবীর পরিচয় উদ্ধারের জন্য যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের কাছে দূর ও গভীর সমুদ্রের তলদেশের কাদা ও শিলা যথেষ্ট মূল্যবান। এঁদের পরীক্ষা করে অন্ততঃ একটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বহিঃত্বকটা প্রথমে আগ্নেয় শিলার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। সেই আদিম আগ্নেয় শিলা নানা নৈসর্গিক কারণে অন্যান্য শিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। পরে শিলা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মাটি। একদিকে গভীর সমুদ্রের তলদেশে লাভ করা প্রাথমিক তথা আগ্নেয়শিলা এবং উপকূলভাগের কাছাকাছি অঞ্চলে পাওয়া নানা রূপান্তরিত শিলা উপরোক্ত সত্যটিকে উদ্ঘাটিত করেছে।

অতিদূরের সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগ্রহ করা মাটিতে বহু জীবাশ্মও লাভ করা গেছে। এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের দেহাবশেষ মিশে আছে যাদের খালি চোখে সনাক্ত করা যায় না। অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই ধরা পড়ে। তাই অতীতে সমুদ্রের বুকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল সে সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠছে বিজ্ঞানীদের মনে। ধরা পড়ছে জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারাটিও।

সাগরতলায় নামতে গিয়ে সাগরজলের নানা বৈচিত্র্যের সন্ধান লাভ করেছেন ডুবুরীরা। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, উপকূলভাগের কাছাকাছি এবং নদীর মোহানার জল বেশ ঘোলাটে। যতই দূরে

যাওয়া যায় ততই সাগরজলের রঙকে পরিবর্তন হতে দেখা যায়। মহীসোপানের প্রান্তীয় অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে জলের রঙ সবুজ। মহীসোপান ছাড়লে জলের রঙটা নীল দেখায়। ঐ নীল জলটা এত স্বচ্ছ যে, আমরা ভাবতেও পারি না। একেবারে যেন কাচের মত কিংবা স্ফটিকের মত। খুব গভীরেও মাছেদের চলাফেরা খালি চোখে ধরা পড়ে।

দূরে সমুদ্রের তলদেশে নামতে গেলেও চারপাশের জলকে নীল দেখায়। কিন্তু সে-জল যত স্বচ্ছ হোক না কেন তলদেশের মাটি দেখা যায় না। এর কারণ সূর্যের সাত রঙের আলোকের কোন রঙের আলোকই মাত্র দেড় হাজার ফুট জলের তলায় পৌঁছতে পারে না।

যেহেতু সূর্যালোক সাত বর্ণের আলোকের সমষ্টি। বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এদের মধ্যে বেগুনীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। বেগুনী অপেক্ষা নীলের একটু বেশী, তারপর আকাশী, এই ভাবে লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা সবার চেয়ে বেশী। আবার কোন বস্তুকে আমরা যে রঙের দেখে থাকি, সেই বস্তুটি সূর্যালোকের সব কয়টি বর্ণের আলোককে শোষণ করে নেয় কিন্তু পারে না বস্তুটি যে রঙের কেবল সেই রঙটিকে। ঐ রঙটিকে প্রতিফলিত করে বলেই তাকে সেই রঙের দেখে থাকি। সূর্যরশ্মি জলে প্রবেশ করলেই আগে বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলি শোষিত হয়ে যায়। মাত্র পঞ্চাশ ফুট গভীরে শোষিত হয়ে যায় লালবর্ণের আলোটি। তারপর কমলা, হলুদ ইত্যাদি অবলুপ্ত হতে থাকে। অবশেষে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নীল ও বেগুনী প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আমাদের চোখটা বেগুনী অপেক্ষা নীলের প্রতিই অধিক সংবেদনশীল। উক্ত কারণে গভীর সমুদ্রের জলকে নীল দেখি। কিন্তু ১৫০০ ফুট গভীরে নীল ও বেগুনী রঙগুলোও শোষিত হয়ে যায়। তখন জলের আর কোন রঙ দেখা যায় না। সব বর্ণের আলোক শোষিত হয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে কালো। তাই গভীর সমুদ্রের তলদেশটা একেবারে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

# সাগরগর্ভে রত্নরাজি

সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ স্থান জুড়ে অবস্থান করছে মহাসমুদ্র আর একটিভাগ মাত্র স্থল। সেই স্থলেই যদি পাওয়া যায় এত হরেক রকমের মূল্যবান সামগ্রী তাহলে জলভাগে কতই না আছে?

সত্যই তাই। সমুদ্রগর্ভে মূল্যবান পদার্থের অন্ত নেই। সার্থক তার রত্নাকর নাম। জলের সঙ্গে, তলদেশে, পাথরের স্তরে কত জায়গায় লুকিয়ে আছে কত সম্পদ! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সাগরের জল থেকে অথবা তার অথৈ জলের তলদেশ থেকে রত্নসমূহকে উদ্ধার করা একরকম দুঃসাধ্যই বলা যেতে পারে। সামান্য কিছু কিছু পদার্থকে কেবলমাত্র আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। আর সমূহ পদার্থকে রত্নাকর সমুদ্র এমনভাবে বন্দী করে রেখেছে যে, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বর্তমানে একরকম নিস্ফল হয়েছে। তাকিয়ে আছি শুধু ভাবীকালের বিজ্ঞানের দিকে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সাগরজলেই মিশে আছে কত মূল্যবান ধাতু। এমনকি তেজস্ক্রিয় ধাতু এবং ভারী জলও। কিন্তু মহীসোপানে খনিও কি কম আছে? লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, রূপা, সোনা প্রভৃতি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ধাতুর আকরিক অনেক আছে সমুদ্রের তলায়। আরও আছে ইউরেনিয়াম ও রেডিয়ামের মত তেজস্ক্রিয় ধাতুর আকরিক। যে কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে দারুণ লোভনীয়। তাই ওদের উদ্ধারের সুষ্ঠু পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বহুদেশ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাগর গর্ভে এত জল রয়েছে, তবু তাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। তার একমাত্র কারণ, সাগরেরজল লোনা। যদি কোন পদ্ধতিতে স্বল্প খরচে জল ও নুন আলাদা করে নেওয়া যেতে পারতো

তাহলে কৃষিকাজ ও পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে আর কোন ভাবনাই থাকতো না। শোনা যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নাকি অনুরূপ একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তবে এমন খরচ বহুল যে, এত জল থেকে লবণকে বিচ্ছিন্ন করে সেচের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কোনদিন কম খরচে প্রচুর মিঠাজল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে মানবজাতির একটা বড় উপকার সাধিত হবে। অপরপক্ষে সাগরজল থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরির কাজেও কোন কোন দেশ আত্ম-নিয়োগ করেছে। আংশিকভাবে সফল হয়েছে জাপান। সমুদ্রের খাঁড়িগুলিতে ঢেউয়ের পরিমাণ বেশী বলে সেইখানে ঢেউ থেকেই সংগ্রহ করেছে বিদ্যুৎ।

আগে আরও বলা হয়েছে, সাগরজলের সঙ্গে মিশে আছে সোনা, রূপা, তামা, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন, ব্রোমিন, ফসফরাস প্রভৃতির কত যৌগ। কিন্তু এদের সবগুলিকে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়নি। কেবল যে সোডিয়াম ক্লোরাইডটি অধিক পরিমাণে মিশে আছে তাকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। আর কিছু কিছু ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামকে।

সোডিয়াম ক্লোরাইডকে আমরা খাদ্যলবণ বলে থাকি। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এই জিনিসটির জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে থাকি সমুদ্রের উপর। আগে সমুদ্রজলকে বাষ্পীভূত করে লবণ তৈরি করা হতো। বর্তমানে সৌরতাপকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় "সোলার কন্‌সেনট্রেশন" পদ্ধতি। উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী সাগরের বেলাভূমিতে ছোট ছোট চৌকো ও অগভীর "বেড" তৈরি করা হয়। সমুদ্র জলকে ঐ বেডে কয়েকদিন রেখে দিলে সূর্যের তাপে জল বাষ্পীভূত হয় এবং জলের ঘনত্ব বেড়ে যায়। তখন ঐ বেশী ঘনত্বের জলকে আরও অগভীর বেডে স্থানান্তরিত করা হয়। এই অবস্থায় জল আরও ভালভাবে বাষ্পীভূত হওয়ার সুযোগ পায় এবং একসময় নুন দানার আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেলাভূমি যদি বালুকাময় হয় তাহলে সিমেন্টের বেড তৈরি করতে হয়।

সমুদ্রজাত লবণ থেকে নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। নুন থেকে তৈরি হয় সোডিয়াম ধাতু, কাপড় কাচার সোডা, কস্টিক সোডা, সোডিয়াম সালফেট প্রভৃতি। কোন কোন পদ্ধতিতে উপজাত হিসাবে ক্লোরিনকেও পাওয়া যায়। নুন থেকে জাত উপরোক্ত পদার্থগুলিকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুত করা হয় ব্লিচিং পাউডার, কাচ, সাবান, গ্লিসারিন, কাগজ, নানাপ্রকার ওষুধপত্র ইত্যাদি অনেক কিছু।

সমুদ্রজল থেকে নুনকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার পর যে তরল পড়ে থাকে তা থেকে ক্যালসিয়াম সালফেট যোগে পৃথক করা হয় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। অন্যান্য ধাতুগুলিকে নিষ্কাশন করতে গেলে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী পড়ে বলে সেগুলিকে নিষ্কাশন করা হয় না। তবে অনেক পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

খাদ্যলবণের পরে আয়োডিনকে উল্লেখ করতে হয়। আমাদের প্রয়োজনীয় আয়োডিনের একটা বড় অংশ সংগ্রহ করা হয় সমুদ্র থেকে। গভীর সমুদ্রে একরকম আগাছা জন্মে। ঐ আগাছাকে পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় তাকে বলা হয় কেল্প। কেল্প থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয় আয়োডিন। তাছাড়া ব্রোমিনকেও পাওয়া যায় সমুদ্র থেকে।

সমুদ্র থেকে দু-ধরনের রত্ন পাওয়া যায়। তাদের একটিরও নাম মুক্তা এবং দ্বিতীয়টির নাম প্রবাল। মুক্তা পাওয়া যায় একজাতীয় ঝিনুকের ভেতর থেকে এবং প্রবাল এক ধরনের কীটের দেহাবশেষ। আগেকার দিনে একমাত্র মুক্তার খোঁজেই ডুবুরীরা সাগরতলায় নামতেন। এখনও ঐ কারণে নামেন। তবে মুক্তা ছাড়াও সাগরের রহস্যভেদ করতে এখন অনেক ডুবুরী অবতরণ করেন।

যে-জাতীয় ঝিনুক থেকে মুক্তা পাওয়া যায় তাকে বলে শুক্তি। শুক্তির মুখ খোলা অবস্থায় কোন কারণে আঘাত পেলে অথবা খোলা মুখে বালুকণা ইত্যাদি প্রবেশ করলে খুব অস্বস্তি অনুভব করে। এই অবস্থায় তাদের শরীর থেকে এক রকমের রস নির্গত

হয় এবং ধীরে ধীরে আঘাতের জায়গাটিকে অথবা বালুকণাকে ঘিরে ফেলে। রসটি শুকিয়ে যখন নরম ও মোলায়েম হয়ে যায় তখন এরা আর অস্বস্তি অনুভব করে না। কিন্তু নষ্টও হয়ে যায় না সেটি। কালক্রমে ঐটি গোলাকার একটি মুক্তার জন্মদান করে।

মুক্তা যত গোল, নিটোল ও বড় হয় ততই তার দাম। খুব বেশীদিন মুক্তাটা শুক্তির ভেতরে থাকলে অনেকটা গোলাপী রঙের হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশী দাম ঐ গোলাপী মুক্তার। কালো মুক্তাও পাওয়া যায়। তবে কালো মুক্তা ক্বচিৎ পাওয়া যায় বলে তারও দাম আছে।

কালো মুক্তাকে প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়। সাদা ও গোলাপী মুক্তা পাওয়া যায় পারস্য উপসাগরে, সিংহল সাগরে, প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানের কাছাকাছি অঞ্চলে, ভূমধ্যসাগরে, ভারত-মহাসাগরে ও লোহিত সাগরে। আজ পর্যন্ত যত মুক্তা উত্তোলিত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দামী মুক্তাটির নাম "বেরেসফোর্ড হোপ"। এটি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এবং এর ওজন দশ তোলা।

মুক্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য বর্তমানে জাপান প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কৃত্রিমভাবে মুক্তার চাষ করছে। সাগর থেকেই শুক্তিকে সংগ্রহ করা হয় এবং একটি বিশেষ ধরনের চৌবাচ্চায় তাদের প্রতিপালন করা হয়। ঐ চৌবাচ্চায় তারা যাতে বংশবিস্তার করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়। শুক্তির একটা বিশেষ বয়স হলে তাদের মুখে পুরে দেওয়া হয় বালির কণা। তারপর তিন-চার বছর পরে তাদের দেহ থেকে বার করানো হয় মুক্তা। বালিকণাকে ওদের মুখে প্রবেশ করানোর কাজটা কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে করতে হয়। তাই মুক্তা চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

মুক্তা ছাড়াও প্রবাল এবং নানা প্রকারের স্পঞ্জের খোঁজে ডুবুরীরা সাগর তলায় নামেন। আগে উন্নত পোষাক আবিষ্কৃত না হওয়ায় এসব খোঁজ করতে অসুবিধা হতো এবং কম গভীরে যতটুকু পাওয়া

যায় তাকেই সংগ্রহ করা হতো। বর্তমানে উন্নত পোষাক ও অক্সিজেনের সিলিণ্ডার বহন করে ডুবুরীরা প্রায় ৬০০ ফুট গভীরে নেমে মুক্তা প্রভৃতি সংগ্রহ করে থাকেন।

সমুদ্র থেকে শঙ্খ এবং ঝিনুককেও সংগ্রহ করা হয়। শঙ্খ থেকে গড়ে উঠেছে শঙ্খ শিল্প, ঝিনুক থেকে ঝিনুকের গুঁড়া ইত্যাদি।

সমুদ্রের তলদেশে শিলাস্তরে যে সব সম্পদ লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূগর্ভস্থ পাললিক শিলাস্তরে সামুদ্রিক অবক্ষেপের সঙ্গে সঞ্চিত সূক্ষ্ম প্রাণিদেহ চাপা পড়ে শিলাস্তরের চাপে ও ভূগর্ভস্থ তাপে সেগুলি তরলপদার্থে পরিণত হয়ে শেষে খনিজ তেলে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ তেল পাললিক শিলাস্তরে বিশেষতঃ বেলে পাথর ও চুনা পাথরের মধ্যে অবস্থান করছে। উক্ত কারণে নবীন ও ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চলে, নদীর বদ্বীপে, প্রাচীন জলাভূমিতে খনিজ তেল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহীসোপান ও অগভীর সমুদ্রের তলদেশেও প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া সম্ভব।

বর্তমানে তেলের চাহিদা প্রচুর। যে হারে কলকারখানা বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ডাঙায় প্রাপ্ত খনিজ তেল প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তাই সবারই ঝোঁক এখন সাগরগর্ভের দিকে। সাগর তীরবর্তী প্রতিটি দেশ এখন অনুসন্ধানকার্য চালাচ্ছে। আবিষ্কৃতও হয়েছে বহু তেলের খনি। বিশেষ করে নর্থ-সী অঞ্চলে আবিষ্কৃত খনির পরিমাণই সর্বাধিক।

ভারতবর্ষও তার পশ্চিম উপকূলভাগে, বঙ্গোপসাগরের তীরভূমিতে অনেক তৈল খনির সন্ধান পেয়েছে। এবং পুরোদমে চালাচ্ছে সমীক্ষার পর সমীক্ষা। তেল অনুসন্ধানের জন্য কয়েকটি জাহাজও নির্মিত হয়েছে। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যে বহু খনি থেকে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

মহীসোপানে এবং অগভীর সমুদ্রের তলদেশে আবদ্ধ খনিজ তেলকে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে বহু সমস্যার সমাধান হতে পারবে।

কিন্তু সাগরগর্ভ থেকে তেল উত্তোলন করার ঝামেলা অনেক। তথাপি কোন কোন দেশ কাজে লেগে গেছে এবং উত্তোলিতও হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটা অসুবিধাও আছে। সাগরগর্ভ থেকে তেল ব্যাপকভাবে উত্তোলন করতে গেলে কিছু কিছু তেল সমুদ্রের জলে মিশবেই। এর প্রভাবে তেলটা উপরিভাগে ভাসতে থাকবে। এতে জলচর প্রাণীদের অক্সিজেন গ্রহণ করার অসুবিধা হবে। তদুপরি সূর্যতাপে কালক্রমে এগুলি অন্য যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত ও ভারী হয়ে যখন তলায় থিতিয়ে পড়বে তখন আরও অসুবিধা হবে জলচর প্রাণীদের। অসাবধানতা বশতঃ অগ্নিকাণ্ড ঘটারও সম্ভাবনা। সাগরবুকে আগুন জ্বললে সে আগুন অবশ্যই তীরের দিকে এগিয়ে আসবে এবং তার স্পর্শ থেকে কিছু কিছু জনপদও রক্ষা পাবে না।

সাগরের আর একটি সম্পদ তার মৎস্যভাণ্ডার। বহু দেশ এখন এই কারবারে লিপ্ত। আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সজ্জিত হয়ে অনেক দেশ জাহাজ ও যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে অহরহ ভেসে আছে সাগর-বুকে। উত্তোলিতও হচ্ছে প্রচুর মাছ। যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে মাছের কথা।

আর এক সম্পদ সামুদ্রিক উদ্ভিদ। নানা প্রকার সুখাদ্য, ওষুধপত্র, প্রসাধন দ্রব্য, পশুখাদ্য, সার ইত্যাদি অনেক জিনিস এখন পাওয়া যাচ্ছে সাগরের উদ্ভিদদের কাছ থেকে। পরের পরিচ্ছেদেই উদ্ভিদদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

# সাগর জলের উদ্ভিদ

আগেকার দিনে মানুষের ধারণা ছিল, ডাঙায় যেমন আমরা ছোট বড় হরেক রকমের উদ্ভিদ, ঘন অরণ্যাণী, ফল-পুষ্প যুক্ত লতা ও গাছ দেখতে পাই ঠিক তেমনটি আছে সাগর তলায়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা গেছে, সাগর তলায় যদিও প্রায় কয়েক হাজার রকমের উদ্ভিদের বাস তবু কেউ ওরা ঠিক ঠিক ডাঙার উদ্ভিদের স্বগোত্র নয়। কত বিচিত্র ধরণের শেওলা আছে, ছাতা আছে, সাধারণ গাছের মত গাছও আছে, কিন্তু একমাত্র কয়েক ধরণের লতা ছাড়া আকারে বড় কেউ নয়। ওদের শেকড়, পাতা, গুঁড়ি, ফল, ফুল কিচ্ছু হয় না। একেবারে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ থাকে বলে।

আমরা জানি, উদ্ভিদের প্রাণ ধারণের জন্য সূর্য-কিরণ একান্ত অপরিহার্য। উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে (যাদের পাতা নেই তাদের কাণ্ডের সবুজ অংশের সাহায্যে) পরিবেশের কারবন্ ডাই-অক্সাইডকে নিয়ে সূর্য-কিরণের উপিস্থিতিতে খাদ্য প্রস্তুত করে। সাগর জলের পরিবেশে অবশ্য প্রয়োজনীয় কারবন্ ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ লাভ করতে পারে। কারণ, সমুদ্রপৃষ্ঠ বায়ুর কারবন্ ডাই-অক্সাইডের একটা বড় অংশকে শোষণ করে নেয়। কিন্তু সমস্যা সূর্য-কিরণকে নিয়ে। তাই যত গভীর পর্যন্ত সূর্য-কিরণ প্রবেশ করতে পারে কেবল ততদূর পর্যন্তই উদ্ভিদ জন্মাতে সক্ষম হয়। গভীর সমুদ্রের তলদেশে, যেখানে কেবল অন্ধকার বিরাজ করছে সেখানে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না।

জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে আবার স্থলজ উদ্ভিদের পার্থক্য অনেকখানি। স্থলে সূর্য-কিরণ সুলভ, উপরে মাটির স্তরে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান থাকে। কিন্তু জলের পরিবেশই আলাদা। ঐ আলাদা পরিবেশের জন্যই জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড সংক্ষিপ্ত ও স্পঞ্জের মত নরম।

তাতে বায়ুপূর্ণ এয়ারেন কাইমা কলা অথবা বায়ু গহ্বর থাকে। কারও বা থাকে বায়ুভর্তি থলে। ঐগুলির সাহায্যেই জলজ উদ্ভিদ ভেসে থাকতে পারে।

অপরদিকে মিঠাজলে যে সব উদ্ভিদ জন্মায়, সে সব উদ্ভিদ সমুদ্রের লোনা জলে বাঁচতে পারে না। সেখানকার পরিবেশে অত্যধিক খাদ্য লবণ ও অন্যান্য অজৈব লবণ বিদ্যমান। মিঠাজলে ও-সব কিছু থাকে না বলা যেতে পারে। তাই লোনা জলে বাসিন্দাদের গঠন বেশ আলাদা। সাগর তলায় এত পলিও নেই। মহীসোপানের পাথরের খাঁজে খাঁজে ওরা আটকে থাকে। যেহেতু ওদের শেকড়-বাকড় থাকে না। তাই তলদেশ বেশ চ্যাপ্টা এবং চ্যাপ্টা অংশটা বেশ দৃঢ়ভাবে পাথরকে ধরে রাখে—যেন আঠার সাহায্যে পাথরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারও কারও কোষে কোষে বিভিন্ন ধরণের অজৈব লবণ সঞ্চিত হয়ে থাকে। যেমন কারও গায়ে খাদ্য লবণ, কারও গায়ে আয়োডিন, কারও গায়ে পটাসিয়াম লবণ ইত্যাদি। লবণের পরিমাণ বেড়ে গেলে প্লাজমা মেমব্রেনের মাধ্যমে বার করেও দিতে পারে।

সব সাগরে আবার দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ সমান নয়। সমান নয় গভীরতা, উচ্চতা ইত্যাদি। অর্থাৎ স্থলভাগে যেমন বিভিন্ন পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় তেমনই জলভাগের মধ্যেও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ। স্থলভাগের শুষ্ক ও উষ্ণ পরিবেশে যে উদ্ভিদ জন্মায় শীতল পরিবেশে তাদের দেখা যায় না। সমতলভূমির উদ্ভিদের সঙ্গে পার্বত্য এলাকার উদ্ভিদের বিস্তর প্রভেদ। ঠিক তেমনটি দেখা যায় সাগর তলায় উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও। কোথাও শীতল জল, কোথাও জল একটু উষ্ণ। কোথাও প্রবাহমান সাগর স্রোত আবার কোথাও জল স্থির। কোথাও বেশী গভীর আর কোথাও কম গভীর। অতএব উদ্ভিদেরাও গড়ে উঠেছে সেই সব পরিবেশকে কেন্দ্র করে।

পরিবেশ অনুযায়ী পুকুরের কিংবা নদীর মিঠা জলে যেমন শেওলা, পানা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক কোটী উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনকে দেখা যায় তেমনই

দেখা যায় সাগর জলেও। কিন্তু সাগর তলার উদ্ভিদদের রঙ বড় বাহারে। কারও রঙ ফিকে সবুজ, কারও গায় সবুজ, কারও ধূসর, কারও বাদামী, কারও বা লাল। কেউ থাকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত, কেউ আংশিক, কেউ জলের উপরে ভাসতে থাকে, আবার কেউ বা ঢেউয়ের মাথায় চেপে নাগরদোলার মত দোল খেতে খেতে এগিয়ে যায়।

আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে সার্গোসো সাগর আছে, তাতে জন্মায় সার্গাসাম নামে এক ধরণের বাদামী বর্ণের আগাছা। এরা বড় অদ্ভূত ধরণের। কখন দেখা যায় সারা সাগর ছেয়ে গেছে সার্গাসামে আবার কখনও তাদের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। এই কারণে আগেকার দিনে মানুষের সার্গাসো সাগর সম্বন্ধে একটা বড় ভীতি ছিল। নাবিকেরা এই ভৌতিক ব্যাপার লক্ষ্য করতেন বলে ভয়ে পাশে ভিড়তেন না। তাছাড়া ঘন আগাছার জঙ্গল ভেদ করে জাহাজকে নিয়ে যাওয়াও ছিল ভয়ানক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সার্গাসামদের হঠাৎ আবির্ভাব ও হঠাৎ তিরোভাবের মূলে আছে তাদের পর্যায়ক্রমে বংশবিস্তার ও মৃত্যু। যখন ছোট থাকে তখন জলের তলায় নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে বলে দেখা যায় না! বড় হলে তাদের গায়ে বায়ুপূর্ণ থলি গজায় এবং তখনই আত্মপ্রকাশ করে জলের উপরে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ওদের ঐ বায়ুপূর্ণ থলিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওরা মৃত্যুবরণ করে এবং থিতিয়ে পড়ে জলের তলায়।

লোহিত সাগরে যে সব আগাছা জন্মায় তাদের গায়ের রঙ একটু লালচে। দূর থেকে তাই উক্ত সাগরের জলকে লাল দেখায়। লোহিত সাগর নামকরণ হয়েছে এই কারণেই। তবে এখানকার আগাছাগুলো সার্গাসো সাগরের মত নয়।

সাগর তলায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত শেওলা, ছাতা ইত্যাদিই বেশীর-ভাগ। তাদের মধ্যে সামুদ্রিক পাম বা তালগাছ বিশেষ আকর্ষণীয়।

ওরা ডাঙার তালগাছের মত এত বড় নয় এবং পাতাও নেই। তাল-গাছের মত একটা গুঁড়ি আছে বটে কিন্তু লম্বায় মাত্র এক থেকে দেড় হাতের মত। শেকড় নেই। মাথাটা ফুলের মত। পাথরের গায়ে গায়ে আটকে থাকে। মনে হয়, কে যেন ছোট ছোট পামগাছকে টবে সাজিয়ে রেখে গেছে। ভারি চমৎকার এরা।

আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের অগভীর মহীসোপান অঞ্চলে বেশ লম্বা লম্বা নানা জাতের লতা জন্মায়। এদের বলা হয় কেল্প। লম্বায় এক-একটি প্রায় ২০০ ফুটের মতও হয়ে থাকে। কেউ কেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সাগরের উপরেও ভাসতে থাকে। দূর থেকে সাপ বলে মনে হয়। এই জাতীয় লতাকে বলা হয় "ডেভিলস্ স্যু লেস" বা দানবের জুতোর ফিতে। একজাতীয় কেল্প আবার দেখতে ঘোড়ার লেজের মত। এরা একটু গভীর জলেই জন্মায়।

কেল্পরা মানুষের অনেক উপকারে লাগে। বিভিন্ন জাতের কেল্প থেকে সংগ্রহ করা হয় সোডিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি। ওদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পরিবেশ থেকে অজৈব লবণ সংগ্রহ করে নিজ দেহে সঞ্চয় করে রাখা। আয়োডিন ইত্যাদি থাকার জন্য নানা রোগেও এদের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সামুদ্রিক শেওলা জাতীয় কয়েক ধরনের উদ্ভিদের পুষ্টিমূল্য যথেষ্ট। ঐ কারণেই জাপান, চীন, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ওদের ব্যাপক-ভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং চাষও করা হয়। ওদের কিন্তু কাঁচা খাওয়া যায় না। একজাতীয় আঠালো পদার্থ তথা অ্যাগার নিষ্কাশন করতে হয়। উক্ত অ্যাগারকে বিভিন্ন খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বাড়ানো হয়ে থাকে। তাছাড়া ঐ অ্যাগার থেকে নানা রকমের ঔষধ-পত্রও প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ঐ শেওলাদের চাষ করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। দরকার হয় না সেচের কিংবা সারের। বাড়েও অত্যন্ত দ্রুত। সাগরের বেলা-ভূমিতে অল্প পরিসর জায়গায় এমনকি চৌবাচ্চায়ও চাষ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আগামীদিনে পুষ্টিগুণযুক্ত শেওলার

ব্যাপক চাষ শুরু হবে এবং ওদের দ্বারা খাদ্যের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে।

সাগরে অন্যান্য যে সব উদ্ভিদ দেখা যায় তাদের মধ্যে এক জাতীয় পানা বেশ অদ্ভুত ধরনের। এরা ছোট ছোট বলের মত। ঢেউয়ের তালে তালে নেচে বেড়ায় এবং মাঝে মাঝে বেলাভূমিতে এসে পড়ে। আকারে এক-একটি কদমফুলের মত।

আরও কত বিচিত্র ধরণের উদ্ভিদকে দেখা যায় সাগর জলে। ডাঙায় যেমন যেখানে সেখানে নানা ধরনের ব্যাঙের ছাতাকে গজিয়ে উঠতে দেখা যায় তেমনই সাগর তলার এক এক জায়গায় এক এক জাতীয় ছাতা যেন উপনিবেশ গড়ে তোলে। কোন কোন জায়গায় শেওলারা এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে, মনে হয় এক একটি শাকসব্জীর বাগান। সাগর তলায় মাছের ঝাঁক এদের খায় এবং ঐখানে খেলা করে।

## সাগর তলার প্রাণী

আদিতে সমুদ্রের বুকেই প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। আদ্যপ্রাণী ছিল এককোষী। সেই এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব-জগতের উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আজকের দিনে স্থলে জলে যত জীব বাস করছে তাদের বংশলতিকা ধরে পেছনের দিকে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সবারই উৎস সেই সামুদ্রিক এককোষী প্রাণী। আবির্ভাব হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দু'শ কোটি বছর আগে। সেদিন যারা এসেছিল তারা অবিকৃত বড় একটা কেউ নেই। যুগে যুগে পৃথিবীর পরিবেশের নানা পরিবর্তন এসেছে। তেমনই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে জীবরা। অনেকের বংশধারা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। কেউ বা টিকে আছে তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে।

যেহেতু পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে বারিমণ্ডল এবং সমুদ্রেই প্রথম জীবের বিবর্তন শুরু হয়েছিল ; তাই সাগরেই স্থলভাগ অপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব থাকার কথা। কিন্তু দেখা গেছে, জল অপেক্ষা ডাঙায়ই জীবদের বৈচিত্র্য অধিক। তথাপি সাগর জলে বসবাসকারী বিচিত্র ধরণের জীবের পরিমাণ কিছু কম নয়। তবে এও সত্য যে, সাগরের সমূহ জীবের রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। বিশেষ করে গভীর সমুদ্রের জীবদের সম্বন্ধে এখনও বহু তথ্য অজ্ঞাত থেকে গেছে। উক্ত কারণে এখনও অব্যাহত আছে সাগর সম্বন্ধে গবেষণা।

সচরাচর সমুদ্র থেকে আমরা যে সব প্রাণীদের লাভ করে থাকি গতির দিক থেকে তাদের তিনভাগে ভাগ করা হয়, (১) প্ল্যাঙ্কটন, (২) চলৎশক্তিহীন এবং তলার স্থায়ী বাসিন্দা এবং (৩) স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন জীব।

(১) প্ল্যাঙ্কটন :—এরা জলের উপর তলের বাসিন্দা। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব এবং উদ্ভিদও। ঝাঁকে ঝাঁকে এক এক জায়গায় বিরাট বিরাট অঞ্চল জুড়ে ভেসে থাকে। এরা চলতে পারে না। কেবল ঢেউয়ের দোলায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাহিত হয়। খালি চোখে ওদের বিশেষ দেখা যায় না। তবে রাত্রিতে যখন ঢেউয়ের মাথায় চেপে দোল খায় তখন মাথাগুলো জোনাকির মত ঝিকমিক করতে থাকে।

প্ল্যাঙ্কটনরা সাধারণত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব ও উদ্ভিদকণা হলেও এদের সঙ্গে দল পাকিয়ে ভেসে থাকে নানাজাতের অসংখ্য মাছ ও কাঁকড়ার ডিম। ওদের সঙ্গে ডায়াটম নামে যে সব এককোষী উদ্ভিদকণা মিশে থাকে সেগুলোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে ভারি চমৎকার দেখায়। যেন নানা কারুকার্য খচিত স্বচ্ছ এক একটি প্ল্যাস্টিকের কৌটা।

প্ল্যাঙ্কটন মাছদের বড় প্রিয় খাদ্য। যেদিকে ওরা ভেসে থাকে সেই দিকে মাছরা দল বেঁধে ছুটে। ওরা প্ল্যাঙ্কটনদের সঙ্গে নিজেদের ডিম এবং শূককেও গিলে ফেলে। তাই মাছেরা এত দ্রুত বংশ বিস্তার করে সাগরকে ভরিয়ে দিতে পারছে না। তা না হলে মাছেরা যে হারে ডিম পাড়ে তাতে কয়েক বছরের মধ্যেই সাগরে তিল ধারণের স্থান থাকতো না। কত ডিম? একটা শুক্তির পেটে থাকে কম করে আট কোটি, লিং নামক একটি মাছের পেটে থাকে আড়াই কোটির মত, কড মাছের পেটে থাকে প্রায় আশি লক্ষ। আমাদের পরিচিত যে ইলিশ মাছ, তার পেটে থাকে ২০ লক্ষের কাছাকাছি ডিম।

অনেকের ধারণা, আদিম দৃশ্যমান জীব ঐ প্ল্যাঙ্কটন রূপেই আবির্ভূত হয়েছিল সাগরবক্ষে।

(২) চলৎশক্তিহীন এবং সাগর তলার স্থায়ী বাসিন্দা :—উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের সবাই অমেরুদণ্ডী। একেবারে চলৎশক্তিহীন স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীরা। ওরা চিরকাল একই জায়গায় নিশ্চল হয়ে

পড়ে থাকে। তাই আগেকার দিনে স্পঞ্জকে উদ্ভিদ বলে মনে করা হতো। অপরদিকে ঝিনুক, শামুক, খড়ি, প্রবাল ইত্যাদি অল্পস্বল্প গমন করতে পারলেও এক এক জায়গায় দল বেঁধে পড়ে থাকে।

স্পঞ্জরা এক আশ্চর্য প্রাণী। জীবনের সাড়া ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তথাপি প্রাণী এরা। গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে বলে ছিদ্রালী প্রাণীও বলা হয়।

ওরা অত্যন্ত নরম এবং ছিদ্রের ভেতরে জল ধরে রাখে। হাতে ধরে চেপে রাখলে জল বেরিয়ে যায় আর স্পঞ্জটাও একেবারে চুপসে যায়। এই অবস্থায় জলে ফেলে দিলে পুনরায় পুর্বাবস্থা ফিরে পায়।

স্পঞ্জদের দেহে বিভিন্ন কোষ সমবায়ে গঠিত কলা থাকে না। ওদের খাদ্যগ্রহণ প্রণালীও তাই অদ্ভুত। সমুদ্রজলে ভেসে আসা খাদ্যকণা, অক্সিজেন ইত্যাদি জলের সঙ্গে তাদের দেহে প্রবেশ করে। আর ওরা খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং জলটাকে একটা বড় ফুটো দিয়ে বার করে দেয়। সেই সঙ্গে নির্গত হয় দেহের বর্জ্যপদার্থগুলি।

ঝিনুক, শামুক, খড়ি, প্রবাল প্রভৃতির গায়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের একটা শক্ত আবরণ থাকে। এরা দলবেঁধে এক এক জায়গায় পড়ে থাকে। খড়ি ও প্রবাল অতি ক্ষুদ্র কীট। কিন্তু ওদের দলে থাকে সহস্র সহস্র কোটি। খড়ি ও প্রবাল উভয়ের দেহ থেকে নির্গত হয় চুনের মত একরকমের পদার্থ এবং এগুলি দীর্ঘকাল ধরে জমতে জমতে এক একটা পাহাড় রচনা করে। ওরা মারা গেলে ওদের দেহাবশেষগুলি সাগর তলায় জমে উঠে। সৃষ্টি হয় এক একটি দ্বীপের। অবশ্য দ্বীপ রচনার মূলে সাগরস্রোত, সাগরের ঢেউ প্রভৃতিরও ভূমিকা আছে। প্রবালের দেহাবশেষ জমে উঠলে তরঙ্গ বা স্রোত বাধা পায় এবং তাদের দ্বারা বাহিত পাথরের টুকরো, পলি, শামুক প্রভৃতি জমা হতে থাকে। প্রবাল-দ্বীপের আকার অনেকটা বলয়ের মত হয়ে থাকে। মাঝখানে জল এবং জলকে ঘিরে থাকে স্থলভাগ। শীতের সময় যাযাবর পাখীরা প্রবাল-দ্বীপ সমূহেই বেশী ভিড় করে। প্রশান্ত

মহাসাগরে আছে অসংখ্য প্রবাল-দ্বীপ। ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরেও প্রবাল-দ্বীপ দেখা যায়।

প্রবাল-কীটরা সাধারণত উষ্ণমণ্ডলের সাগরসমূহে ১০০ ফুটের কম গভীরে এবং পরিষ্কার জলে বাস করে থাকে। ওরা নানা রঙের হয়। তবে লাল রঙের প্রবাল বেশী দেখা যায়। প্রবালের খোলসকে পালিশ করে অলঙ্কার তৈরি করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ রত্ন হিসাবেও ব্যবহার করেন।

প্রবালের মত খড়ি-কীটরাও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। ওদের দেহ থেকেও চুনের মত পদার্থ নির্গত হয় এবং কালক্রমে সাগর তলায় খড়ির পাহাড় রচনা করে। ইংলণ্ডে ডোভারের খড়ির পাহাড়টি এইভাবে তৈরি হয়েছে।

সাগরে এমন কিছু কিছু জীব আছে, যারা নিজেরা চলতে পারে না অথচ অপরকে অবলম্বন করে চলাফেরার সুযোগ গ্রহণ করে। সাগর কুসুম এই জাতীয়। ওরা সন্ন্যাসী কাঁকড়ার পিঠে চেপে বসে। কাঁকড়া চলতে থাকলে সাগরকুসুমরা তাদের বিষাক্ত হুল দিয়ে শিকার ধরে। ঝিনুকের মত গায়ের রঙ এবং খোলসযুক্ত বার্ণাকল নামে একধরণের জীব চলমান নৌকা কিংবা জাহাজের গায়ে চেপে বসে। সাগর জলে কোন খুঁটি ইত্যাদি ভেসে থাকলে তাকেও অবলম্বন করে। ভয়ানক ধারাল ওদের সম্মুখভাগ। তাই ধারেপাশে সহজে কেউ আসে না।

চলতে পারে না অ্যামিবা ও জেলিফিস জাতীয় প্রাণীরা। ঢেউয়ের দ্বারা চালিত হয় এবং কখনও কখনও বেলাভূমিতেও নিক্ষিপ্ত হয়।

অ্যামিবা এককোষী, সাদা ও থলথলে। প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা বোঝা যায় না। জেলিফিসদের অবশ্য বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। ওরা জেলির মত থলথলে বলেই অনুরূপ নাম। দেহটা লম্বায় প্রায় সাত-আট ফুট। কিন্তু ওদের যে কর্ষিকাগুলি থাকে তাদের কোন কোনটির দৈর্ঘ্য ১০০ ফুটেরও বেশী। দেহে থাকে দু-ধরনের কোষস্তর। বাহিরের স্তরটি দেহত্বকরূপে কাজ করে এবং ভেতরের স্তরটা খাদ্য পরিপাক করে।

(৩) **স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন জীব** :—এই দলে অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী উভয় ধরনের জীব আছে। অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যারা—তারা হল তারা-মাছ বা স্টারফিস, অক্টোপাস, স্কুইড, সিপিয়া, সমুদ্র-শশা বা সি-কিউকামবার এবং চিংড়ি-কাঁকড়া প্রভৃতি খোলসযুক্ত প্রাণী। মেরুদণ্ডীদের মধ্যে পড়ে ছোট-বড় নানা আকারের মাছ ও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী।

সামুদ্রিক-শশা, অক্টোপাস ও স্কুইড বড় অদ্ভুত ধরণের জীব। সমুদ্র-শশাদের দেখতে অনেকটা শশার মত বলে এই ধরণের নাম। ওদের দেহে থাকে তিনটি কোষস্তর। বাহিরে ত্বকের স্তর, মাঝে পেশীস্তর ও ভেতরে পরিপাকের স্তর। এদের দেহে কাঁটা থাকে এবং ইচ্ছামত চলাফেরাও করতে পারে। জেলিফিসের পরবর্তী ধাপের জীব ওরা।

দ্বিতীয় ধরণের কাঁটাযুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা স্টারফিস বা তারা-মাছ। বইতে তারার ছবি যেমনটি দেখা যায় এরা অবিকল তেমনটি। বেশ চ্যাপ্টা ও পাতলা ধরণের। চারদিকে পাঁচটি লম্বা লম্বা ছুরির ফলার মত অংশ। প্রত্যেকটি ফলায় থাকে অজস্র পা। ঐ পায়ের সাহায্যে ওরা চলাফেরা করে এবং শিকার ধরে।

স্কুইড, সিপিয়া, অক্টোপাস প্রভৃতিরা উন্নত ধরণের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। স্কুইডরা আকারে বেশ বড় হয়ে থাকে। কিন্তু সিপিয়া ও অক্টোপাসরা তত বড় হয় না। এরা সবাই দ্রুতগামী শিকারী।

এক এক ধরণের স্কুইড লম্বায় বিশ-ত্রিশ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। তাই স্কুইডদের বলা হয় সমুদ্র-দানব বা সী-মনস্টার। এদের দেহে থাকে টুপির মত আবরণ এবং সামনে থাকে দশটি লম্বা লম্বা কর্ষিকার মত বাহু। ঐ কর্ষিকা দিয়েই তারা শিকারকে জাপ্টে ধরে। স্কুইডদের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ওরা জল টেনে নিয়ে সেই জলকে পরিত্যাগ করার সময় গতিশক্তি লাভ করে এবং পেছনের দিকে ছিটকে পড়ে। নিউটনের তৃতীয় গতিশক্তি অনুযায়ী জেট বিমানরা যেমন চালিকা-শক্তি অর্জন করে, এরাও জল গ্রহণ ও পরিত্যাগের ভিতর

দিয়ে তেমনই গতিশক্তি লাভ করে। অমেরুদণ্ডী হলেও চক্ষু আছে এদের।

সিপিয়াদেরও মুখে কর্ষিকা থাকে। আর থাকে একটা আবরণ। কিন্তু স্কুইডদের মত তত বড় হয় না।

অক্টোপাসরা বেশ অদ্ভুত ধরণের। অমেরুদণ্ডী হলেও বেশ দ্রুত-গতিসম্পন্ন। এদের আটটি কর্ষিকা থাকে এবং কর্ষিকাগুলি বেশ লম্বা। মুখে আবার থাকে ধারাল ঠোঁট। শিকার দেখলে দ্রুত ছুটে যায় এবং শিকারকে জাপ্টে ধরে। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। ওদের কর্ষিকায় আবার বহু চোষক আছে এবং চক্ষুও আছে এদের।

অক্টোপাস সম্বন্ধে বহু গালগল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, অক্টোপাসরা ডুবুরীদের এমনকি জাহাজকেও আটকে দেয়। এমন ধারণা কিন্তু ভুল। অক্টোপাসরা ভয়ানক শিকারী বটে কিন্তু জাহাজ তো দূরের কথা মানুষকে আটকাবার মত এত বড় তারা হয় না। অর্থাৎ অক্টোপাসের কাহিনী কেবলমাত্র রোমাঞ্চকর গল্পের উপকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। চিংড়ি ও কাঁকড়ারা আমাদের খুবই পরিচিত সামুদ্রিক প্রাণী। ওদের দেহে শক্ত আবরণ থাকে। কথিত আছে, ওদেরই বংশধারা সেই আদি থেকে অনেকটা অবিকৃতই থেকে গেছে।

সমুদ্রে ছোট-বড় বহু কীটও বাস করে। এদের মধ্যে এক অদ্ভূত ধরণের কীটকে বলা হয় টিউব ওয়ার্ম। এদের না আছে চোখ, না আছে মুখ গহ্বর আর না আছে পরিপাকতন্ত্র। অথচ জীবন আছে ওদের। দেখতেও কিম্ভূতকিমাকার। ওরা সাধারণত ব্যাকটিরিয়াদের দেহে পালন করে থাকে এবং ব্যাকটিরিয়ারা তাদের বেঁচে থাকার উপাদান জোগায়। অপরদিকে ব্যাকটিরিয়ারা সমুদ্রতলে ফাটলে সঞ্চিত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্রহণ করে থাকে। বলা বাহুল্য পাথরের খাঁজে খাঁজে এবং ফাটলেই লুকিয়ে থাকে টিউব ওয়ার্মরা। কখনও কখনও ফাটল থেকে উপরের দিকেও মাথা তোলে।

মাছ ঃ—সমুদ্রে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছের সংখ্যাই অধিক। ছোট-বড় কত প্রজাতির যে মাছ আছে তা বলে শেষ করা যায় না। ওরা জলে ভাসতে পারে এবং বেশীর ভাগ ঝাঁক বেঁধে থাকে।

মাছদের ভাসার মূলে আছে তাদের পেটের মধ্যে বায়ুভর্তি থলে বা পটকা। ঐ পটকার মধ্যে তারা প্রয়োজন মত বায়ু বাড়াতে বা কমাতে পারে। যখন যে গভীরতায় মাছরা চলাফেরা করে তখন পটকায় হাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে নিজেকে জলের ঘনত্বেয় সমান অথবা কাছাকাছি করে ফেলে। তাই ডুবে ভেসে থাকতে কোন অসুবিধা হয় না তাদের। কিংবা শক্তিও খরচ করতে হয় না। আর ঝাঁক বাঁধার উদ্দেশ্য, একতাবদ্ধ হয়ে থাকা এবং শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া। এক এক ঝাঁকে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ মাছ থাকে। পরস্পর গায়ে গায়ে আটকে থাকে যেন। অথচ পরস্পর তারা জায়গা বদল করতেই থাকে। শত্রুর উপস্থিতি একজন টের পেলেই সবাইকে সাবধান করে দেয় এবং দ্রুত সরে পড়ে।

মাছ যেহেতু প্রাণী তাই তারও শ্বাসগ্রহণের প্রয়োজন হয়। সাগর তরঙ্গ যেটুকু বায়ুর অক্সিজেনকে জলে দ্রবীভূত করিয়ে নেয় তাতেই মাছদের কাজ চলে যায়, কিন্তু সরাসরি অক্সিজেন পায় না। তাই তাদের ফুলকা থাকে। ঐ ফুলকাই জলের ভেতর থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে সাহায্য করে এবং শ্বাসকার্য চালায়।

জলে বাস করে বলেই তাদের দেহের গঠনটা বেশ আলাদা। দুদিকে সরু এবং মাঝখানটা মোটা। ঠিক যেন নৌকার মত। নৌকার হাল যেমন নৌকাকে বিভিন্ন দিকে বাঁকতে সাহায্য করে তেমনই মাছের লেজটাও। পেটের পাখনাগুলো দিয়ে নৌকার দাঁড়ের মত জল কেটে অগ্রসর হয়। অপরদিকে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলের উপযোগী বলে মাছ ডাঙ্গায় বেশীক্ষণ বাঁচতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য প্রধান যে শ্বাসঅঙ্গ, সেটি তাদের ফুলকা। ঐ ফুলকা ডাঙ্গায় একেবারে অচল। ডাঙ্গায় উঠলেই অক্সিজেনকে গ্রহণ করতে না পারার জন্য ছটফট করতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যে মারা যায়।

তবে আশ্চর্য ধরণের মাছও আছে। যারা জলের বাহিরে বহুদিন এমনকি দু-এক বছরও বেঁচে থাকতে পারে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফুসফুস মাছ। এরা পটকার সাহায্যে সরাসরি বাতাস গ্রহণ করতে পারে এবং তারই মাধ্যমে দীর্ঘকাল শ্বাসকার্য চালাতে পারে।

মাছেরা সবাই যে-কোন গভীরতায় থাকতে পারে না। যতদূর পর্যন্ত সূর্যকিরণ প্রবেশ করে মাছেরা সাধারণত ততদূরই ঘোরাফেরা করে। তাছাড়া নিচের দিকে জলের চাপও বেশী। তাই উপরে যারা থাকে তারা নিচের দিকে যায় না। তলায় অল্প আলোকের জায়গায় এবং পরিশেষে একেবারে অন্ধকার তলদেশে অন্য ধরণের মাছদের রাজত্ব। ওদের দেহের গঠনও আলাদা।

মাছের কথা বলতে গেলে আগে যার কথা উল্লেখ করতে হয় সে হচ্ছে হাঙ্গর। সবচেয়ে হিংস্র ওরাই। ওদের কেউ কেউ মানুষও খেয়ে থাকে। তবে মানুষ খায় না এমন হাঙ্গরের সংখ্যাও কম নয়। এরা এত রাক্ষুসে যে, খাওয়ার গন্ধ পেলে সহজে ছাড়তে চায় না। সব সময় আহার করছে প্রচুর মাছ।

বহু জাতের হাঙ্গর আছে। এক এক জাতের হাঙ্গর লম্বায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুটের মত হয়ে থাকে। এক জাতের হাঙ্গরের মাথাটা হাতুড়ির মত। ওরাই সবচেয়ে বেশী রাক্ষুসে। আর দেখতেও বড় অদ্ভুত। মাথায় হাতুড়ি এবং হাতুড়ির দুপাশে দুটি ড্যাবডেবে চোখ।

হাঙ্গরদের দাঁতের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একেবারে তীক্ষ্ণ ও ধারাল দাঁত। বয়স বাড়লে তাদের দাঁত পড়ে গেলেও পুনরায় নতুন দাঁত গজায়। নানা আকৃতির ও নানান দৈর্ঘ্যের হাঙ্গর দেখা যায়। কোন কোন হাঙ্গরের মাংস মানুষও খায়। হাঙ্গরের তেলও অনেক কাজে লাগে।

দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক মাছ উড়ুক্কু মাছ। এরা অবশ্য পাখীর মত এন্তার হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। ডানা নেই কিংবা পালকও নেই। যা আছে তা কেবল সামনের দিকে লম্বা পাখনাজোড়া। লেজে এবং অন্যান্য জায়গার পাখনাও বেশ বড়।

ওরা লাফ দিয়ে জলের উপরে উঠে। পুকুরে রুই-কাতলারা যেমন লাফ দেয় ঠিক তেমনটি। তবে ওরা ইচ্ছে করে লাফ দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে এবং পাখনায় ভর করে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়েও যায়। প্রায় ছ-সাতশ গজ পর্যন্ত তারা হাওয়ায় ভর করে ছুটে যেতে পারে। গতিবেগও ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইলের মত। যাঁরা সাগর দিয়ে যাতায়াত করেন তাঁরা দেখেন ওদের ঝাঁক ধরে আকাশে গা ভাসিয়ে দিতে। অনেক সময় জাহাজেও পড়ে যায় তারা।

সবচেয়ে বিস্ময়কর মাছ হচ্ছে বৈদ্যুতিক মাছ। আজ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ রকমের বৈদ্যুতিক মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক বাইন মাছ বা ইলেকট্রিক ঈল মাছ সত্যই বড় ভয়ঙ্কর মাছ। মাঝে মাঝে ওদের দেহ থেকে প্রায় তিনশ ভোল্টেরও বেশী বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসে—যার স্পর্শে মানুষও মারা যায়।

ঈলরা দু-ধরনের। সাধারণ ঈল এবং বৈদ্যুতিক ঈল। দু-জাতের ঈলেরই আচরণ বড় অদ্ভুত। সাধারণ ঈলরা বড় ভ্রমণপ্রিয়। জীবনের প্রথমভাগ তারা কাটায় সমুদ্রে। তারপর বড় হলে ভ্রমণের নেশা যেন পেয়ে বসে। উচ্চস্রোত অবলম্বন করে শত শত মাইল ঘুরে ঘুরে একসময় নদীতে অথবা হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইখানে তারা ডিম পাড়ে এবং ডিম পাড়ার কিছুকাল পরেই মৃত্যুবরণ করে। এদিকে ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরুলে, বাচ্চারা নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় ঘোরাফেরা করে বেড়ে উঠে। তারপর একসময় তারা চলে যায় সমুদ্রে। ডিম পাড়ার সময় হলে তারা আবার আসে নদীতে। সার্গাসো উপসাগরে শরৎকালে বহু ঈলকে জমা হতে দেখা যায়। কোন কোন ঈল আটলান্টিক মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ছুটে এসে ইংলণ্ডের উপকূলে ডিম পাড়ে।

বৈদ্যুতিক ঈলরা এমন যাযাবর নয়। তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের দেহ থেকে নির্গত হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ। কাছে পিঠে শত্রু দেখলেই উক্ত প্রবাহকে পাঠায়। সত্যই বড় ভয়ঙ্কর ওরা।

শুধু বৈদ্যুতিক ঈল নয়, আরও বহু জাতের মাছ আছে, যাদের

দেহ থেকে এই ধরনের বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্গত হয়। তাদের মধ্যে স্কেট মাছ, টরপেডো মাছ, বজ্র মাছ ইত্যাদি প্রধান। সাধারণত ওরা উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে বাস করে।

বিষাক্ত মাছের সংখ্যাও বড় কম নেই সমুদ্রে। বিষের জন্য ওদের এড়িয়ে চলে সবাই। অথচ নিজেরা দিব্যি শিকার ধরে খায়। বিষাক্ত মাছদের মধ্যে টোড ফিশ, স্টোন ফিশ প্রভৃতি প্রধান।

এক জাতের মাছ আছে, যাদের তরোয়াল মাছ বলা হয়। ওদের ঠোঁটটা তরোয়ালের মত এবং ছুঁচলো। শত্রুকে ঐ তরোয়াল ঠুকেই ঘায়েল করে। তবে আকারে ওরা খুব বেশী বড় নয়।

মাছেরা মেরুদণ্ডী হলেও ডিম্বপ্রসবী। আর অনেক ডিম্বপ্রসবী সমুদ্র কচ্ছপ ও কিছু কিছু সামুদ্রিক সাপ। তবে সামুদ্রিক সাপ ডাঙার হেলে সাপের মত সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। সমুদ্রের বহু সাপ বিষাক্ত এবং লম্বায়ও বেশ বড় হয়।

মাছদের ও সমুদ্র কচ্ছপদের ডিম পাড়ার ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। ডিম পাড়ার সময় হলে গভীর সমুদ্র থেকে ঝাঁক বেঁধে বহু মাছ নদীর মোহানায় মিঠাজলের সন্ধানে আসে, পূর্বে বর্ণিত ঈল মাছ তো বটেই, আমাদের অতি পরিচিত ইলিশ মাছ ও ছুটে আসে নদীর মোহানায়, সাগর কচ্ছপরা আকারে বেশ বড় হয়ে থাকে। ওদের কোন কোন প্রজাতি, যারা প্রশান্ত মহাসাগরে বাস করে তারা শীতকালে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে ছুটে আসে ভারতের পূর্বউপকূলে। অনেক চিংড়িও অগভীর জলে ছুটে আসে ডিম পাড়ার জন্য।

এই প্রসঙ্গে সী-হর্স নামের সামুদ্রিক প্রাণীটির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ওরা লম্বায় তেমন বড় হয় না। সবচেয়ে যারা বড় তাদের দৈর্ঘ্য দশ-বার ইঞ্চির বেশী নয়। মুখটা ওদের ঘোড়ার মত দেখতে বলেই সী-হর্স বলা হয়। ওরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। গায়ে থাকে কাঁটা। ডিমপাড়া ও সন্তান পালনটাই এদের অদ্ভুত। মা সী-হর্স ডিম পাড়ে আর বাপ সেগুলোকে আপন বুকের কাছে সংলগ্ন একটা থলেতে রেখে দেয় এবং তা দিয়ে বাচ্চা বার করে।

**সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী**ঃ—সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সর্বাগ্রে তিমির নাম করতে হয়। এরা ঠিক মাছ নয়। ওরা ডিম পাড়ে না, বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। মাছের মত এদের গায়ের রক্ত শীতল নয়। ডাঙার স্তন্যপায়ীদের মতই ওদের গায়ে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত। উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরে ওদের সর্বাধিক দেখা যায়। অন্যান্য জায়গায়, বিশেষ করে নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে ওদের আদৌ দেখা যায় না।

তিমিরা নাকি জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছিল। তারপর বেশ কয়েক পুরুষ ডাঙায় অতিবাহিত করার পর খাদ্যের ঘাটতির জন্যই পুনরায় জলে নেমে যায়। যখন ওরা ডাঙা থেকে জলে পুনরায় বাসের জন্য গমন করে তখন অবশ্য জলে বাস করার দৈহিক গঠন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই জলে বাস করতে অসুবিধা হয়নি তাদের।

তিমিদের বৈশিষ্ট্য তাদের ফোয়ারা। ওরা দীর্ঘ সময় জলের মধ্যে থাকতে পারে না। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে জলের উপরে মাথা তুলতে হয় শ্বাসগ্রহণের জন্য। যখনই শ্বাস নিয়ে জলে ডুবে যায় তখনই মাথার ছিদ্র দিয়ে জল ফোয়ারার আকারে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই ফোয়ারা বহু দূর থেকে দেখা যায় এবং তিমি শিকারীরা ঐ ফোয়ারা দেখেই তিমির উপস্থিতি বুঝতে পারে।

তিমিরা আকারে সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে। এত বড় যে, এক-একটি লম্বায় প্রায় একশ ফুট এবং ওজনে প্রায় একশ টনের মত হয়। জলে-স্থলে যত জীব বাস করে, তাদের মধ্যে তিমিই সর্ববৃহৎ জানোয়ার। ডাঙায় সবচেয়ে বড় জানোয়ার হাতীর ওজন মাত্র চার-পাঁচ টনের মত।

আগেকার দিনে ধারণা ছিল, তিমিদের চেয়েও বৃহত্তম জানোয়ার সমুদ্রে আছে। ঐ বৃহত্তম জানোয়ারের নাম তিমিঙ্গিল। অর্থাৎ তিমিকেও গিলে খেতে পারে। একশ টনের মত একটি জীবকে গিলে খাওয়ার মত জানোয়ার যে কত বড় হতে পারে তা সহজে অনুমান

করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এত বড় জানোয়ার সমুদ্রে নেই। সবচেয়ে বড় প্রজাতির যারা, তারা নীল তিমি এবং এদেরই দৈর্ঘ্য সত্তর ফুট থেকে একশ ফুটের মত।

ছোটবড় বহু প্রজাতির তিমি সমুদ্রে আছে। ওদের মুখে থাকে ঝালর এবং সেই ঝালরে দাঁত থাকে। ওরা এক জায়গায় দীর্ঘকাল বাস করে। ছুটোছুটি করে সাগর তোলপাড় করে না। শরীরের অনুপাতে মাথা বেশ বড়। তবে এত বড় যে জানোয়ার, সে চিংড়ি, প্ল্যাঙ্কটন প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণীদেরই খেতে ভালবাসে। সীল মাছ, স্কুইড ইত্যাদিকেও খায়। সব প্রজাতির তিমির গায়ের রঙও সমান নয়। কারও গায়ের রঙ নীল, কারও ধূসর, কারও সাদা ইত্যাদি।

ছোট জাতের তিমিও অনেক আছে। তাদের মধ্যে "নারওয়াল" নামক এক ধরনের তিমির শুঁড় থাকে। তবে হাতির মত শুঁড় নয়, অনেকটা বর্শার মত সামনে বেরিয়ে থাকে। ওরা ঐ শুঁড় দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে। এই জাতীয় কোন কোন তিমির দুটো শুঁড়ও থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাগরের সবচেয়ে বড় জানোয়ার তিমি হলেও তিমিদের চেয়ে কিছু ছোট এক জাতের মাছও আছে। এরা হাঙ্গর ও তিমির মাঝামাঝি যেন। আকারে চল্লিশ পঞ্চাশ ফুটের মত, নাম হোয়েল শার্ক। হাঙ্গরের মতই রাক্ষুসে এবং আকারে এত বড় হলেও মাছ।

সমুদ্রের কম গভীরতায়, নদীর মোহানায় তিমির মত ফোয়ারা ছড়াতে পারে এমন ছোট ছোট জীবও আছে। ওদের বলা হয় শুশুক। আকারে খুব বড় হয় না। তাদের কোন কোনটি দৈর্ঘ্যে সাত-আট ফুটের মত হয়ে থাকে। উক্ত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের শুশুকও দেখা যায়। শুশুকরা স্তন্যপায়ী এবং জলচর জীবদের ভেতরে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। মানুষ ওদের পোষ মানিয়েছে এবং মৎস্য শিকারের জন্য কাজে লাগায়। দূরের মাছের ঝাঁককে নাকি ওরা

ভুলিয়ে ডাঙার দিকে নিয়ে আসে আর তখনই জাল ঘিরে মাছদের উত্তোলন করা হয়। তবে শুশুকরা নানা জাতের। সবচেয়ে উন্নতদের নাম ডলফিন।

মেরু সাগরের খুব ঠাণ্ডার রাজ্যে থাকে আরও দু-জাতের স্তন্যপায়ী। তাদের বলা হয় সীল ও সিন্ধুঘোটক। আসলে সিন্ধুঘোটকরাও অনেকটা সীলদের মতই। তবে আকারে বড় এবং মুখ থেকে এক-জোড়া হাতীর দাঁতের মত বড় বড় দাঁত গজায়।

নামটা সিন্ধুঘোটক হলে কি হবে, আদৌ ঘোড়ার মত নয়। বরং জলহস্তীর সঙ্গে চেহারার মিল খানিকটা আছে। তবে হাতীর মত দাঁত দুটো ঝুলে থাকে। দাঁতগুলো লম্বায় পনের থেকে পঁচিশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইংরাজীতে ওদের বলা হয় "ওয়ালরাস"।

শীতল মহাসাগরে সিন্ধু হস্তী বা সী-এলিফ্যাণ্টও দেখা যায়। এদের দাঁত থাকে না। থাকে ছোটখাট একটা শুঁড়। আকারেও বেশ বড়। অর্থাৎ আঠার থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং বেশ গোলগাল চেহারা।

সমুদ্রে সমুদ্র সিংহ বা সী-লায়নও থাকে। সিংহের সঙ্গে মিল বড় একটা নেই। থাকার মধ্যে ঘাড়ে কয়েক গাছা চুল। বরং জল হস্তীদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। এরাও সিন্ধু হস্তীদের মত বেশ বড়সড় এবং মেরুদেশের সাগরের বাসিন্দা।

ওয়ালরাস বা, সিন্ধুঘোটক, সিন্ধু হস্তী, সিন্ধু সিংহ সবাই সীল মাছ জাতীয়। তবে সীল মাছের চেয়ে অনেক বড় হয়। সীলরা আকারে ছোট। কোন কোন সীলের পেটের চামড়ায় খুব নরম নরম লোম থাকে। ঐকারণে পোষাক তৈরির কাজে আগে হাজার হাজার সীলকে হত্যা করে চামড়া সংগ্রহ করা হতো। সীলরাও ঠাণ্ডা জলের বাসিন্দা।

সীল জাতীয় সবাইর চারখানা পাখনা এমনভাবে থাকে যাতে তাদের চারখানা পা বলেই মনে হয়। তবে পাখনাগুলি পায়ের কাজও করে থাকে। কারণ ওরা ডাঙায় উঠে আসতে পারে এবং

পাখনাগুলো ডাঙায় ঘষতে ঘষতে হেঁটেও যায়। সাধারণত বাচ্চা দেওয়ার সময় ওরা ডাঙায় উঠে আসে। ডাঙায় অবশ্য দ্রুতগতিতে হাঁটতে পারে না।

আরও বিভিন্ন সমুদ্রে কত যে জীবজন্তু থাকে তার বিবরণ দেওয়া খুবই কষ্টকর। অনাবিষ্কৃত জীব এখনও অনেক আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। যে-সব জীবজন্তু আবিষ্কার করাও হয়েছে তাদের সবার সম্বন্ধে বলতে গেলে বিরাট একটা বই হয়ে যাবে। রচিত হয়েছেও অনেক পুস্তক এবং গবেষকদের বিবরণীকে লিপিবদ্ধ করে এখনও প্রকাশিত হয় কত পুস্তক-পুস্তিকা।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এমন দু-একটি দুর্লভ মাছ কালেভদ্রে পাওয়া যায়, যাদের পূর্বপুরুষ নাকি আজ থেকে প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিল। অর্থাৎ এদের আবির্ভাবকাল মেসোজোয়িক মহাযুগের পূর্বে প্যালিওজোয়োকি মহাযুগের শেষে। এতদিন পর্যন্ত ওদের বংশধারার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। ওদের ফুসফুস দেখে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, মাছও উভচর উভয়ের মধ্যবর্তী ওরা। মাছের ফুসফুস পরিবর্তিত হয়ে কিভাবে উভচরের ফুসফুসে পরিণত হয়েছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঐ মাছরা। ওদের বলা হয় শিলাকান্ত মাছ, কোয়েলাকান্ত মাছ ইত্যাদি। লম্বায় চার-পাঁচ ফুটের মত এবং ওজনে ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোগ্রামের মত এক-একটি হয়ে থাকে। ঐসব মাছ বিজ্ঞানীদের কাছে বড্ড লোভনীয়। জ্যান্ত মাছ দুর্লভ হলেও ওদের জীবাশ্ম পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

## গভীর জলের মাছ

মানুষের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত চাপা এবং যাঁদের কার্যকলাপ হঠাৎ টের পাওয়া যায় না। তাঁদের আমরা গভীর জলের মাছ বলি। উপমাটা গভীর সমুদ্রের মাছ বললে আরও বোধহয় ভাল হতো। কেননা আজিও গভীর সমুদ্রের মাছদের সম্বন্ধে বহু তথ্যই অজ্ঞাত থেকে গেছে।

গভীর সমুদ্রের মাছদের সম্বন্ধে যতটুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে —তা কেবল বীর ডুবুরীদের দ্বারাই। অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ ধরনের তৈরি প্রকোষ্ঠের মধ্যে অবস্থান করে তাঁরা নেমেছেন তলদেশে। প্রকোষ্ঠটি এমন যে, তাতে জল প্রবেশ করতে পারে না। জলের উপরে ভাসতে থাকে জাহাজ আর জাহাজ থেকে প্রকোষ্ঠটি নামিয়ে দেওয়া হয় তলায়। সেখানে ডুবুরী বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু দেখে ছবি এঁকে ফেলেন। কোনরকম বিপদের সম্মুখীন হলে উপরে সঙ্কেত পাঠানোরও ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ করে টেলিফোনের মাধ্যমেই তাঁরা সংযোগ রক্ষা করে চলেন।

ডুবুরীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, গভীর সমুদ্রের তলদেশে একেবারে অন্ধকারের রাজত্বে যে-সব মাছ বাস করে তারা আকারে ছোট ও বিকট দর্শন। অন্ধকারে চলতে গেলে আমরা যেমন হাতে লণ্ঠন অথবা টর্চলাইট সঙ্গে করি সেখানকার অধিকাংশ মাছরাও তেমনই আলোর সাহায্য গ্রহণ করে। তবে সে আলো তারা নিজের দেহ থেকেই সৃষ্টি করতে পারে। বাহির থেকে আলোর উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় না।

সাগরতলায় সব মাছ অবশ্য আলো সৃষ্টি করতে পারে না। চোখও নেই অনেকের। অর্থাৎ জন্ম থেকেই ওরা অন্ধ। অন্ধকারে যেমন আমরা হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজি ওরাও তেমনি সাগরতলায়

হাতড়ে বেড়ায়। কিন্তু বাঁচতে হলে তো আহার অন্বেষণ করতে হবে! চোখ নেই, তবে কেমন করে তারা আহার অন্বেষণ করে?

যাদের দেহ থেকে আলো নির্গত হয় না বা যারা কেবল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় তাদের কারও কারও পাখনার অগ্রভাগ বেশ সরু সরু ও লম্বা। বোয়াল, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতির গোঁফ থেকে ঢের বড়। ঐ পাখনার অগ্রভাগের সাহায্যে তারা বুঝে নেয় কোথায় কি আছে। ওরা ইচ্ছামত সঞ্চালিতও করতে পারে এবং শিকারের উপস্থিতি টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে।

গভীর জলে মাছের পরিমাণ কিন্তু বড় কম। উপরের দিকে মাছরা যেমন কিলবিল করে তলাতে তার লক্ষ ভাগেরও একভাগ নেই। যারা থাকে তাদের অধিকাংশের মাথা খুব বড়। এমনকি সারা শরীরের অর্ধাংশ জুড়ে মাথা, বিরাট তাদের হাঁ। আর তাতে থাকে সুতীক্ষ্ণ দাঁত। মাথার অনুপাতে শরীর বেজায় সরু। মুখের হাঁ-টা বড় হওয়ার জন্য নিজের দেহের চেয়েও বড় শিকারকে গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু পেটটা তো খুব সরু। গিলে ফেললে শিকারটা যায় কোথায়?

ঐখানেই বৈশিষ্ট্য ওদের। সঙ্গে সঙ্গে পেটটাকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে ফেলে। অনেকটা ডাঙার সাপের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে ঠিক তেমনি। সাপটা নিজের দেহের চেয়েও মোটা বড় বড় ব্যাঙকে কায়দা করে গিলে ফেলে আর পেটটাও ফেঁপে উঠে।

গভীর সমুদ্রের মাছের গায়ের রঙ কারও একেবারে কালো এবং কারও বা একটু লালচে ধরনের। এমন কিছু কিছু মাছ থাকে, যাদের গায়ের রঙটা আবার কাচের মত স্বচ্ছ। বাহির থেকে বেশ দেখা যায়, দেহের ভেতরে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে, হৃৎপিণ্ড কাঁপছে এবং খাদ্যও পরিপাক হচ্ছে। এত স্বচ্ছ ওদের শরীর। স্বচ্ছ হওয়ার জন্যই ওরা শত্রুর চোখে সহজে ধুলো দিতে পারে।

ওদের আত্মরক্ষার কৌশলটাই বড় অদ্ভুত ধরনের। গায়ের আলো ঐ আত্মরক্ষা ও আহার অন্বেষণের জন্যই। তারা যে আলো

জ্বালে তা বিভিন্ন রঙের এবং বেশ বাহারে। আমরা যেমন বিভিন্ন রঙের বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করি, নিয়ন আলো যেমন সাদা, নীল, লাল ইত্যাদি আলো পর পর বদল করে এদের অনেকে তেমনই রঙ-বেরঙের আলো সৃষ্টি করতে পারে। সে আলো সৃষ্টি হয় কারও গায়ে, কারও পাখনায়, কারও গোঁফের ডগায়, কারও বা দাঁতে। বলা বাহুল্য, কারও কারও দাঁত এতবড় যে হাঁ বন্ধ করলেও দাঁতগুলো সামনের দিকে বেশ উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকে। যেমন সব সময় মুখটা বিকৃত করে দাঁত খিঁচিয়ে আছে।

আলো সৃষ্টির ব্যাপারে কুড়ুল মাছ এবং এক ধরনের স্কুইডের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাতের আকাশে উড়ো-জাহাজ যেমন দুপাশে লাল নীল ইত্যাদি আলো জ্বেলে যায়। কুড়ুল মাছরা তেমনই দেহের দুপাশে সবুজ ও বেগুনী আলো জ্বালে। স্কুইডরা নিয়ন লাইটের মত আলো বদল করতে পারে। কখনও সাদা, কখনও নীল, কখনও সবুজ, কখনও ধূসর ইত্যাদি বহু রঙই পর পর পরিবর্তন করে—যা নিয়ন আলো পারে না।

এরা আলো সবসময় জ্বালে না। শিকারের খোঁজে অথবা ভয় পেলে কিংবা শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে আলো জ্বেলে দেয়। তারপর নিভিয়েও দিতে পারে। যখন ওরা আলো জ্বেলে শিকার খোঁজে তখন ওদের শত্রুও ছুটে আসে ঘায়েল করার জন্য। আর টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। এক জাতের চিংড়ি থাকে, যারা শত্রুর মুখোমুখি এসে পড়লেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করে এবং পরক্ষণে নিভিয়ে দেয়। তখন একেবারে বোকা বনে যায় শত্রু।

সাগরের গভীর জলে শয়তান মাছ বা ডেভিল ফিস নামে এক ধরনের মাছকে দেখা যায়। ওরা যেমন বিকট দর্শন তেমনই অদ্ভুত। স্ত্রী শয়তান মাছ আকারে মাত্র দশ-বার ইঞ্চির মত হয়ে থাকে। পুরুষ মাছরা নিতান্তই ছোট। স্ত্রী মাছরা আট-দশটা পুরুষ মাছকে বহন করে চলে। আর পুরুষ মাছরা একবার তাদের গায়ে আটকে

গেলে আর ছাড়ে না। একসময় স্ত্রী মাছটারই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং স্ত্রী মাছের গায়ের রস খেয়ে বেঁচে থাকে। আরও মজার ব্যাপার, স্ত্রী মাছটা মারা গেলে যে আট-দশটি পুরুষ মাছ তাদের দেহকে আশ্রয় করেছিল তারা সবাই মারা যায়। সত্যই প্রকৃতির খেয়াল বড় অদ্ভুত।

গভীর জলে যে-সব মাছ বাস করে, তাদের খাদ্যের বড় কষ্ট। সেখানে গাছপালা, শেওলা ইত্যাদি জন্মাতে পারে না বলে খাদ্যরূপে উদ্ভিদকে তারা পায় না। খুব বিরল ওরা। তাই সহজে খুঁজেও পায় না শিকারকে। তার উপর প্রত্যেকের আত্মরক্ষার হাতিয়ারগুলো বেশ ভাল। কেউ অন্ধকারে বিচরণ করে, কারও শরীর থেকে আলো নির্গত হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিতে সবাই পটু। আবার গভীর জল থেকে উপরে উঠে খাবার সংগ্রহ করাও ওদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ গভীর জলে থাকে বলে জলের প্রচণ্ড চাপ তাদের সহ্য করতে হয় এবং সেইভাবেই তারা গড়ে উঠেছে। উপরে জলের চাপ কম। অতএব উপরে উঠলে কম চাপে শরীর ফেঁপে উঠবে এবং একসময় আপনা হতে ফেটে মারা যাবে। তাহলে জীবনধারণের জন্য খাদ্য ওরা পায় কোথা থেকে ?

অনেকে মনে করেন, উপরের স্তরে প্রচুর প্রাণী থাকে। তারা মারা গেলে তাদের দেহ থিতিয়ে পড়ে তলায় এবং সেই মৃতদেহগুলিই ওরা আহার করে। তবে কথাটি সম্পূর্ণ সত্য কিনা আজও জানা যায়নি।

## সাগরের মৎস্য সম্পদ

সাগর থেকে যে-সব সম্পদ আহরণ করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ মৎস্য। বর্তমানকালে তো বটেই সুদূর অতীতেও একে প্রধান সম্পদরূপে মনে করতো মানুষ। তাইতো মানব সভ্যতার আদিপর্বে মাছের আশায়ই মানুষ ঘর বেঁধে ছিল নদীর তীরভূমিতে।

প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসাবে মাছের চাহিদা অপরিসীম। ইওরোপের নানা দেশ মৎস্য শিকার করে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন বসতি পূর্ণ অঞ্চলে মাছ একটি প্রধান খাদ্য। আমাদের বাঙালীদের তো কথাই নেই। অন্ততঃ একটা টুকরা মাছ না হলে খাদ্য রুচিই আসে না। তবে বাঙ্গালী অপেক্ষা জাপানীরা অধিক মাছ খেয়ে থাকে।

ইওরোপীয় দেশসমুহের মধ্যে পর্তুগালই সবচেয়ে বেশী মাছ খেয়ে থাকে। তাদের পরে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের লোক মাছকে খাদ্য হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করে। তাছাড়া তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের তথা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহের বাসিন্দারা মাছ খেয়ে থাকে। আবার যে-সব দেশে মাংস সুলভ সে সব দেশে মাছের চাহিদা কম। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ। তবে মাছ যে তারা আদৌ খায় না এমন নয়।

উক্ত কারণে মৎস্য শিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব জায়গায় যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায় অর্থাৎ জাপান, উত্তর পশ্চিম ইওরোপ, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম উপকূলে সব সময় প্রচুর মাছ ধরা হয়। প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী ধৃত হয় বলে ওদের সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং বাহিরে চালান দেওয়া হয়।

মৎস্য শিকারের ব্যাপারে জাপান বেশ অগ্রণী। সমুদ্র থেকে মাছ ধরার নতুন নতুন সরঞ্জাম এরা আবিষ্কার করেছে। তীর থেকে বহু দূরে তারা এগিয়ে গিয়ে মাছ শিকার করে থাকে। কাজে লাগায় শব্দোত্তর তরঙ্গকে। মাছের পেটে বায়ুপূর্ণ থলি থাকে বলে শব্দোত্তর তরঙ্গকে পাঠালে যেখানে মাছের ঝাঁক আছে সেইখানে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং যন্ত্রে ধরা পড়ে। তাই মাছের ঝাঁক খুঁজতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত হওয়ায় জাপানের উপকূলে এত মাছ ধরা পড়ে যে, জাপানের মাছ একটা বড় শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং মাছ-শিল্প আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়েও দাঁড়িয়েছে। কেবল জাপানে নয় পাশ্চাত্যেও গড়ে উঠেছে মৎস্য শিল্প এবং বহু দেশ এখন মৎস্য ব্যবসায়ে লিপ্ত।

জাপানে সুবৃহৎ মৎস্য শিল্প গড়ে ওঠার মূলে অবশ্য অনেকগুলো কারণ আছে। চারদিকে সমুদ্র এবং সমুদ্র অগভীরও। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত এবং একদিক থেকে উষ্ণ জাপান স্রোত বা কুরোসিও স্রোত এবং অপরদিক থেকে শীতল কিউরাইল স্রোত এসে মিলিত হওয়ায় উপকূলে প্রচুর মাছের সমাবেশ ঘটে। সেইসব মাছের মধ্যে হেরিং, ম্যাকারেল, সার্ডিন, টুনি প্রভৃতি অতি উন্নত ধরনের মাছ থাকে। অপরদিকে জাপানে লোকসংখ্যার অনুপাতে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। তাই মাছ ধরা তাদের একটা প্রধান উপজীবিকা। উক্ত কারণে তারা অধিক মাছ খেয়ে থাকে এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাছ ওরাই সরবরাহ করে থাকে।

জাপান ব্যতীত উত্তরও-পশ্চিম ইউরোপের উপকূলে, উত্তর পশ্চিম আটলান্টিকের উপকূলভাগে এবং উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে বিরাট বিরাট মৎস্যক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জায়গায় মহীসোপান প্রশস্ত এবং উষ্ণ ও শীতল উভয় ধরনের সমুদ্রস্রোত মিলিত হওয়ায় প্রচুর মাছের সমাগম হয়। তাই গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ মৎস্যক্ষেত্র।

উত্তরও-পশ্চিম ইউরোপের উপকূলে তথা গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে ধৃত হয় হেরিং, কড,

ম্যাকারেল, হ্যাডক প্রভৃতি মাছ; উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে তথা ওয়াশিংটন, বৃটিশ কলম্বিয়া ও আলাস্কায় ধরা পড়ে প্রচুর স্যামন, কড, হ্যালিবাট ও ম্যাকারেল এবং উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিকের উপকূলে কেবলমাত্র হেরিং, ম্যাকারেল প্রভৃতি মাছ নয়, প্রচুর চিংড়ি ও কাঁকড়া ধরা পড়ে।

সমুদ্রে যেসব মাছ ধরা পড়ে তাদের সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। "পিলেজিক" অর্থাৎ কম গভীরের মাছ এবং "ডেমার্সেল" বা গভীর জলের মাছ। উভয় ধরণের মাছই দামী ও সুস্বাদু। কড, হ্যালিবাট প্রভৃতি মাছের আবার তেলও দামী, বাজারে যে "কডলিভার ওয়েল" পাওয়া যায়, তা কড মাছের তেল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সমুদ্র থেকে প্রতি বছর প্রচুর মাছকে উত্তোলন করা হয়। একমাত্র জাপানই শিকার করে বছরে প্রায় এক কোটি টনের মত মাছ। দেখা গেছে, পৃথিবীতে বছরে মোট ধৃত মাছের শতকরা ১৪ ভাগ ধরা পড়ে একমাত্র জাপানে। এখানে মাছ ধরার কাজে লিপ্ত আছে প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক। একেবারে আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সাগরে। সরকারের পরিচালনাধীনে মৎস্য শিকারীদের নিরাপত্তারও বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই দুর্ঘটনা প্রভৃতি খুব কম ঘটে।

নানা সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বছরে মোট সাত কোটি চব্বিশ লক্ষ টনের মত মাছ সমুদ্র থেকে উত্তোলন করে। তাদের মধ্যে জাপানে ধৃত হয় এক কোটি সাড়ে সাত লক্ষ টন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ৯০ লক্ষ টন, চীন ৪৬.৫ লক্ষ টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ লক্ষ টন, পেরু ৩৩.৫ লক্ষ টন, নরওয়ে ২৬.৪ লক্ষ টন, ভারত ২৩.৬ লক্ষ টন, কোরিয়া ২৩.৫ লক্ষ টন, থাইল্যাণ্ড ২২.৬ লক্ষ টন, ডেনমার্ক ১৭.৪ লক্ষ টন, চিলি ১৭ লক্ষ টন, ইন্দোনেশিয়া ১৬.৫ লক্ষ টন, ফিলিপাইন ১৫.৬ লক্ষ টন, স্পেন ১৩.৮ লক্ষ টন, এবং বাদবাকি দু-কোটি চব্বিশ লক্ষ টন শিকার করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ।

অন্যান্য সমীক্ষা থেকে আরও জানা যায়, জাপন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, নরওয়ে এবং ভারত—এই সাতটি দেশ প্রতি বছর মোট ধৃত মাছের শতকরা ৫৬ ভাগ শিকার করে থাকে। এবং আরও দেখা যায় অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা এশিয়া মহাদেশেই অধিক মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এশিয়া মহাদেশে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ শতকরা ৪২ ভাগ। ভারতে বর্তমানে মৎস্য শিকারের জন্য প্রায় প্রতি বছর পরিকল্পনার পর পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হচ্ছে। ধৃত মৎস্যের পরিমানও বাড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

মোট কথা, মানুষের কাছে মাছ একটি বড় সম্পদ। আগে মানুষের ধারণা ছিল, সমুদ্রের মাছ ফুরিয়ে যেতে পারে না বা কোনকালে শেষ হবে না। বরং বাড়তেই থাকবে, কিন্তু এ-ধারণা ঠিক নয়। বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে মাছের ঘাটতি লক্ষ্য করায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে যথেচ্ছভাবে এবং কোনরূপ বিবেচনা না করেই মৎস্য শিকার করে চলেছে। মাছ ধরার সরঞ্জামের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যেমন গভীর সমুদ্রে মাছের ঝাঁক নির্ণয় করার জন্য শব্দোত্তর তরঙ্গকে কাজে লাগানো হচ্ছে, ডলফিনদের নিয়োগ করতে সচেষ্ট হচ্ছে কোন কোন দেশ, ইত্যাদি। তাই ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার মুখে এই সম্পদটি।

সাগরে মাছ হ্রাস পেতে থাকার অন্যান্য কারণও আছে। বহু মাছ নদীর মোহানায় মিঠা জলের সন্ধানে ছুটে আসে ডিম পাড়তে। ঐ ডিম পাড়ার সময়ই মৎস্য শিকারীরা ঘায়েল করে তাদের। কয়েক রকমের চিংড়িকে চাষ করার জন্য সমুদ্র বা নদী থেকে যেভাবে চিংড়ি মাছের শুক সংগ্রহ করা হয় তাতে অপরাপর মাছের পোনা যথেষ্ট মারা পড়ে। যেসব মাছ গভীর জলে ডিম পাড়ে অথচ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর তারা অগভীর জলের দিকে ছুটে আসে তারা মৎস্য শিকারীদের হাত থেকে বড় একটা রক্ষা পায় না। তার উপর

আছে বর্তমানের নদী ও সমুদ্রের তীরভূমিগুলিতে গড়ে ওঠা অসংখ্য কলকারখানা। কলকারখানা থেকে বর্জ্যপদার্থগুলি অহরহ মিশছে নদী ও সমুদ্রের জলে। স্থলভাগে শস্যকে রক্ষার জন্য যেসব কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে তাদের কিছু কিছু অংশও বাহিত হয়ে পড়ছে নদী ও সাগরের জলে। ওতে মাছের বংশবৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়ে চলেছে।

অবশ্য একটা বড় মাছ এককালে যত ডিম পাড়ে তার সংখ্যা কিন্তু নগণ্য নয়। একরকম অসংখ্য বলা যায়। কিন্তু সমস্ত ডিম ফুটে বাচ্চা বার হতে পারে না। আবার বহু ডিম ও বাচ্চাকে ঐ মাছেরাই ধরে ধরে খায়। তার উপর নদীর মোহানাগুলিতে জল দূষণের ফলে অধিকাংশ ধ্বংস হয়েও যাচ্ছে। তাই ঘাটতি ঘটছে উক্ত সমুদ্র সম্পদের। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নানা ধরনের পরিকল্পনাও রচনা করা হচ্ছে উক্ত সম্পদটিকে রক্ষা করার জন্য।

## সাগর—আগামীদিনের প্রত্যয়

বর্তমানের মানবসভ্যতা নানা সমস্যায় জর্জরিত। অবশ্য সব সমস্যার মূলে আছে ক্রমবর্ধমান জনসমস্যা। পৃথিবীর স্থলভাগ সীমিত। তিনভাগ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে কেবল সমুদ্র-সমুদ্র আর সমুদ্র। আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির স্থলভাগের প্রতি কৃপণতা পরিলক্ষিত হলেও, ঐ পরিমাণ সমুদ্র না থাকলে স্থলভাগটা এত মনোরম হয়ে উঠতে পারতো না। বিপরীতপক্ষে পৃথিবীবক্ষ যদি তিনভাগ স্থল ও একভাগ জল ধারণ করতো তাহলে সারা পৃথিবীটাই একটা উষর মরুভূমিতে পরিণত হতো আর উপকূলভাগগুলিতেই কিছু জীবজন্তু ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা হতো।

অতএব তিনভাগ স্থান জুড়ে সমুদ্রের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানব সভ্যতার। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যাতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ-তিনগুণ, এমনকি চতুর্গুণে ঠেকবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই জনসংখ্যা বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং আগামী শতবর্ষের মধ্যেই জনসংখ্যা হয়ত বর্তমানের চারগুণ হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর মানুষ পা রাখবে কোথায় ?

পৃথিবীর সমূহ স্থলভাগকে আবার বাসগৃহ তৈরির কাজে ব্যয় করা যাবে না। বনজঙ্গল, খোলা মাঠ, কৃষিযোগ্য জমি, অবশ্যই রাখতে হবে। ফসল ফলানো তো বটেই, নিশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তদুপরি জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-হারে কলকারখানা স্থাপিত হয়ে চলেছে তাতে কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে জমা পড়ছে না। উক্ত গ্যাসকে শুদ্ধ করতে পারে একমাত্র উদ্ভিদ এবং কিছুটা সাগরজলে দ্রবীভূত হয়। অতএব লোকালয়ে ফাঁকা জায়গা ও গাছপালা অবশ্যই রাখতে হবে। অপরদিকে জনসংখ্যার সঙ্গে সমতা রাখতে গাছপালার সংখ্যা

বরং বাড়াতে হবে। শুধু কি তাই? স্থলভাগে সুবৃষ্টির জন্য বড় বড় গাছ ও অরণ্যকে নির্বাসিত করা চলবে না। তাহলে ভবিষ্যতে বাসগৃহ সমস্যার কেমন করে সমাধান করবে মানুষ?

এককালে মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহে ও উপগ্রহে মনুষ্যোবাসোপযোগী পরিবেশ আছে। যেমন এককালে মানুষ মনে করতো, মঙ্গলে জল আছে, ভাল একটা আবহমণ্ডল আছে, মানুষ অপেক্ষা উন্নত জীব আছে, ইত্যাদি। কিন্তু আজ প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে বা উপগ্রহে মনুষ্যবাসের পরিবেশ আদৌ নেই। শুক্রের আবহমণ্ডলকে সাফ করে এবং প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে যুক্ত করে মনুষ্যবাসের পরিবেশ রচনা করা সহজ নয়। আর ঐ অসাধ্যকে যদি কোন দেশ সাধন করে তাহলে সে তো তাদেরই উপনিবেশে পরিণত হবে! এদিকে জলহীন, বায়ুহীন, নগণ্য আকর্ষণবলযুক্ত; ভয়ঙ্কর উল্কা ও সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির দ্বারা আক্রান্ত চাঁদ ও মঙ্গলের এবড়ো খেবড়ো মৃত্তিকায় মানুষের বসতি স্থাপন এখনই কল্পনার মধ্যে আসা যাচ্ছে না। বৃহস্পতি, শনি এবং তাদের উপগ্রহগুলোকে আয়ত্তে আনা আরও অসম্ভব ব্যাপার। যদি বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই তবু অন্ততঃ শতবর্ষ অতিক্রান্ত হবেই হবে। কিন্তু ঐ সময়কালের মধ্যে মানুষ তো অনেক বেড়ে যাবে! তখন তারা যাবে কোথায়?

উক্ত ভয়াবহ সমস্যাটির সমাধানকল্পে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন ঐ সাগর ও মহাসাগরগুলির উপরে নিবদ্ধ হয়েছে। সত্যই তো রত্নাকর সে! তার গর্ভে রত্নের অভাব নেই। অপরদিকে বিস্তীর্ণ তার এলাকা, বুদ্ধি করে যদি তার বুকে বাসস্থান গড়া যায় তাহলে আপাততঃ কয়েক শতাব্দী নিশ্চিতভাবে কাল কাটানো যেতে পারে। কিন্তু কেমন করে সাগর বুকে ঘর বাঁধা সম্ভব হবে?

বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে বহু আশার বাণী শোনাচ্ছেন। তাঁরা ভাবছেন, নিরক্ষরেখার উভয়দিকে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে ভাসমান শহর গড়ে তোলা এমন কিছু কঠিন

ব্যাপার নয়। তবে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি অঞ্চল ছেড়ে উত্তরে বা দক্ষিণে সম্ভব নয়। কেননা এর পরের অংশ বেশ ভয়াবহ। মেরু থেকে নেমে আসা হিমবাহগুলি কাছাকাছি অঞ্চলগুলি পর্যন্ত চলে আসে। তার উপরে আছে বিভিন্ন ধরনের সাগরস্রোত। ফলে আবহাওয়াও অত্যন্ত খারাপ। প্রায় সারা বছর ধরে চলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। অতএব কর্কটকান্তি থেকে মকরক্রান্তি পর্যন্ত বেশ নিরাপদ। এবং এখানকার মনোরম আবহাওয়া শহর গড়ার পক্ষে উপযুক্ত।

কিন্তু ভাসমান শহর কেমন করে নির্মাণ করা যাবে? যদি হয় তাহলে সেসব শহরের বাসিন্দারা খাদ্য, পানীয়, বিদ্যুৎ ইত্যাদির চাহিদা কেমন করে মেটাবে!

এ বিষয়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনেক আশার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁরা এমন এক-একটি পরমাণু শক্তিচালিত নৌবহর তৈরি করেছেন—যাতে সহস্র-সহস্র মানুষ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে পারে। তাতে বহুতলযুক্ত বাড়ী আছে, খেলাধূলার জায়গা আছে, হোটেল-রেস্তোরাঁ-প্রেক্ষাগৃহ আছে, উড়োজাহাজ-হেলিকপ্টার ওঠানামার সুবিধা আছে, ইত্যাদি অনেক কিছু। খরচবহুল হলেও এ জাতীয় পরিকল্পনা যে মানুষের কল্যাণকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানীদের আরও বিশ্বাস, সাগরের বুকে খাদ্যের অভাব থাকবে না। প্রচুর মাছ খাদ্যের চাহিদার একটা বড় অংশ পূরণ করবে। তাছাড়া ছোট ছোট জলাধার নির্মাণ করে পুষ্টিকর শেওলাদেরও চাষ করা চলবে। এবং ঐ শেওলা থেকেই তৈরি করা যাবে নানা পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাবার।

দ্বিতীয়ত পানীয় জলের সমস্যারও সমাধান করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এমনিতে পাতন পদ্ধতিতে সাগর জল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা যায়, তবে এই পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জলের চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই তাঁরা একরকম প্লাস্টিকের তৈরি অতি সূক্ষ্ম তারজালির মত জিনিস আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রের সাহায্যে ওরই ভেতর দিয়ে সমুদ্র জলকে চালনা করলে বিচ্ছিন্ন হয়

দ্রবীভূত লবণসমূহ এবং লাভ করা যায় স্বাদু জল। তাকে শোধন করে নিলেই ভাল পানীয় জল পাওয়া যাবে।

বিদ্যুতের জন্যও স্থলভাগের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। যেহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠে জলের তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস, অথচ মাত্র এক হাজার ফুট গভীরে তাপমাত্রা কমতে কমতে ৫° সেলসিয়াসে এসে গেছে। তাপমাত্রার এই ব্যবধানকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং ঐ পদ্ধতিতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ লাভ করা যাবে তাতে কারও কোন অসুবিধা হবে না। পদ্ধতিটি অত্যন্ত খরচবহুল হওয়ায় এখনও অনুসৃত হচ্ছে না।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে এমনই কিছু শহর মহাসাগরের বুকে আত্মপ্রকাশ করবে। সেইসব শহরের উপর দিয়ে ছুটবে গাড়ী, ওঠানামা করবে উড়োজাহাজ, বন্দরে বন্দরে ভিড়বে জাহাজ এবং গড়ে উঠবে নানা ধরণের শিল্প।

শিল্পের সম্ভাবনাও অতি উজ্জ্বল। জল থেকে যে খাদ্যলবণ বিচ্ছিন্ন হবে তাকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠবে সমুদ্রলবণজাত শিল্পগুলি। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে ম্যাগনেসিয়াম নডিউল উত্তোলিত করে সংগ্রহ করা যাবে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ। সমুদ্র থেকে মুক্তা সংগ্রহ করা হবে এবং মুক্তার চাষ করাও অসুবিধা হবে না।

তাছাড়াও দেখা গেছে, সমুদ্রের মহীসোপানগুলিতে লুকিয়ে আছে প্রচুর পেট্রোলিয়ামের খনি। এদের উত্তোলিত করাও তখন সহজ হবে এবং নানা শিল্প গড়ে উঠবে।

সমুদ্রের আর এক সম্পদ—তার উপকারী আগাছাগুলিকে কাজে লাগিয়ে নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হতে পারবে এবং গড়ে উঠবে নানা রাসায়নিক শিল্প এবং তৈরি হবে নানাপ্রকারের ওষুধ। তার উপর মাছ তো আছেই। একদিকে যেমন গড়ে উঠতে পারবে বড় বড় মৎস্য ব্যবসায় কেন্দ্র অপরদিকে কৃত্রিমভাবে মাছের চাষ করে সাগরবক্ষকে ভরিয়ে দিতে পারবে। সাগরকে ঘিরে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও নানান ধরনের পরিকল্পনা আজ তাই মানুষের মনে নব নব

আশার সঞ্চার করেছে। এরই মধ্যে ছিন্ন হয়ে গেছে মহাসমুদ্রের রহস্যজাল এবং দূরীভূত হয়েছে সাগর সম্বন্ধে ভীতি। বর্তমানে আবার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার হওয়ার ফলে মহাসাগরে লুক্কায়িত অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ থেকে আরম্ভ করে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সবই ধরা পড়ছে। আবহবিজ্ঞানের উন্নতি, রেডার ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সহজে লাভ করা যাচ্ছে। অতএব ভয় নেই মানবসভ্যতার। আগামীদিনে তার জয়যাত্রার নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি বহন করে আসছে মহাসাগর ও তার সুবিশাল জলরাশি।

তবে ভয় অন্যত্র। এমনিতে মানুষ যেভাবে সাগরজলকে দূষিত করে ফেলছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাগরের বহু প্রাণীর লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। নদী ও সমুদ্রতীরে অজস্র কলকারখানা গজিয়ে ওঠায় সেখান থেকে রাশিকৃত আবর্জনা সাগরজলে মিশে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্ত কীটনাশকের অবশেষও আসছে আর পড়ছে তৈলবাহী জাহাজ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তেল। আরও বিপদের কথা, তেজস্ক্রিয় জ্বালানীর ছাইকে নিমজ্জিত করা হচ্ছে গভীর সমুদ্রের তলদেশে। তার উপর মানুষ যদি সাগরের বুকে বসতি স্থাপন করে এবং কলকারখানা গড়ে তোলে তাহলে সারা সাগরটাই কিছুদিনের মধ্যে বিষিয়ে উঠবে।

সুখের কথা, বর্তমানে মানুষ তার অপকর্মগুলিকে বুঝতে পেরেছে এবং সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টাও করে চলেছে। হয়ত মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে মানুষ এগুলিকে বেশ কিছুটা অতিক্রমও করতে পারবে। তখন সাগর বুকে বাসের কোন সমস্যা থাকবে না। উন্নত মৎস্যচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে সাগরবক্ষ ভরিয়ে দেবে, এন্তার বিদ্যুৎ ও খাদ্য লবণ সংগ্রহ করে, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করবে, জমজমাট হয়ে উঠবে সাগরের বুকখানা। অতএব ভয় নেই। রত্নাকরের রত্নরাজিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অচিরে রচনা করবে আর এক সভ্যতার ইমারত।

---